দুনিয়ার ওপারে

LIFE AFTER LIFE

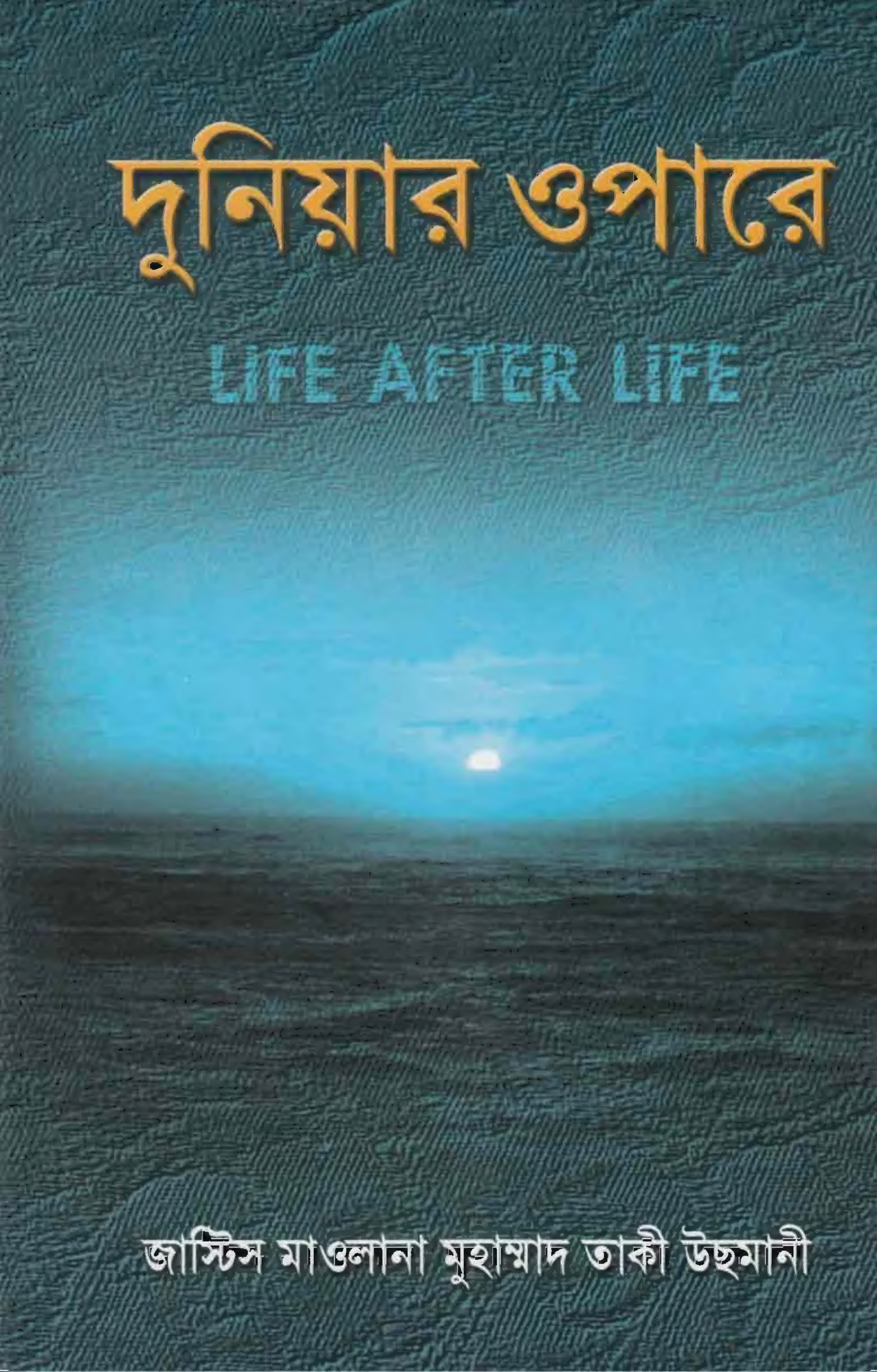

জাস্টিস মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উছমানী

দুনিয়ার ওপারে

[মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা লোকদের
বিরল ও বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা]

মূল
শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, দাঈ, বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়ীতা
ভাইস প্রেসিডেন্ট: ইসলামী ফিকহ্ একাডেমী, জেদ্দা, সৌদী আরব
শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম : দারুল উলূম, করাচী

অনুবাদ
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
দাওরা ও ইফ্তা ঃ জামি'আ ফারুকিয়া, করাচী
উস্তাযুল হাদীস ঃ জামি'আ ইসলামিয়া, ঢাকা
খতীব ঃ রাজারদেউরী জামে মসজিদ, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

দুনিয়ার ওপারে

মূল ঃ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

প্রকাশক
আবু সা'দ
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২৮৯৫৭৮৫

পঞ্চম মুদ্রণ ঃ মার্চ ২০০৮ ঈসায়ী
চতুর্থ মুদ্রণ ঃ শাবান ১৪২৭ হিজরী
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ সফর ১৪২৫ হিজরী
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ শাবান ১৪২৩ হিজরী
প্রথম মুদ্রণ ঃ সফর ১৪২২ হিজরী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ নাজমুল হায়দার
কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা

মুদ্রণ ঃ **মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স**
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-13-4

মূল্য : ষাট টাকা মাত্র।

DUNIAR OPARE
By : Mufty Muhammad Taqi Usmani
Translated by : Muhammad Habibur Rahman Khan
Price : TK. 60.00 US $ 5.00 only

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد

আমাদের বর্তমান বই 'দুনিয়ার ওপারে' আমেরিকার বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিক ডাক্তার 'রেমণ্ড এ মোদী' কর্তৃক রচিত সমগ্র দুনিয়াব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থত্রয়

1. Life After Life
2. The Light Beyond
3. Reflection on Life After Life

সম্পর্কে জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, জাষ্টিস মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উছমানী সাহেব কর্তৃক ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত পর্যালোচনামূলক রচনা دنیا کے اس پار এর বঙ্গানুবাদ।

ডাক্তার মোদীর প্রথম গ্রন্থ Life After Life প্রকাশিত হওয়ার পর মাত্র এক বছরের সামান্য সময়ে ত্রিশ লক্ষ কপি বিক্রি হয়।

এ তিনটি গ্রন্থে তিনি মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা লোকদের মৃতপ্রায় অবস্থায় অবলোকনকৃত বিস্ময়কর ও কৌতুহলোদ্দীপক দৃশ্যাবলী ও অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন।

পাকিস্তানের স্বনামধন্য আলেমে দ্বীন জাষ্টিস মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উছমানী সাহেব কুরআন ও হাদীছের আলোকে ডাক্তার মোদীর উপস্থাপিত এ সকল বিষয়ের পর্যালোচনা করেছেন, যা পাকিস্তানের বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা, 'রোজনামা জঙ্গ'-এর উপসম্পাদকীয় কলামে ৩০শে মে ১৯৯৬ ইং, ৫ই জুন ১৯৯৬ ইং ও ১২ই জুন ১৯৯৬ ইং তিন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এর ফলে

পরবর্তীতে এই পর্যালোচনা পুস্তিকা আকারেও প্রকাশ করা হয়।

মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট আকীদা এই যে, মানুষের দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়, তার জীবন অনন্ত। মৃত্যু আসলে স্থান পরিবর্তনের নাম। এ সম্পর্কে ইসলামী আকীদা স্বচ্ছ ও সুদৃঢ় করার জন্য কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে আমাদের ধারণা রাখতে হবে। সে বিষয়গুলো এখানে সংক্ষেপে পেশ করা হচ্ছে ঃ—

১. আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে আল্লাহ পাক যে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাহলো আমাদেরকে ঐ সকল বিষয়ে অবগত করানো যা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী, কিন্তু আমরা নিজে নিজে নিজস্ব বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা তা জানতে পারি না। অর্থাৎ, তা আমাদের মেধাবহির্ভূত।

২. আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জন্য নিশ্চিত ইলম হাসিল করার একটি বিশেষ মাধ্যম যা সাধারণ মানুষের নিকট নেই, তাহলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ওহী লাভ করা। সেই ওহীর মাধ্যমেই তাঁরা ঐ সকল বিষয়ে জানতে পারেন, যা আমরা স্বীয় দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বিবেক–বুদ্ধি দ্বারা অনুধাবন করতে অক্ষম। যেমন দূরবীক্ষণ দ্বারা মানুষ দূরের এমন বস্তু দর্শন করতে পারে, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দর্শন করা সম্ভব নয়।

৩. কোন নবীকে নবী স্বীকার করে তাঁর প্রতি ঈমান আনার অর্থ এই যে, আমরা এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছি এবং পরিপূর্ণরূপে মেনে নিয়েছি যে, এমন যা কিছু তিনি বর্ণনা করেন যা আমরা জানি না, দেখি না, তা সবকিছুই তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে জেনে আমাদেরকে অবগত করান। সে সকল বিষয়ের সবকিছুই অক্ষরে অক্ষরে সত্য, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

৪. আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম কখনো এমন কোন কথা

বলেন না, যা অযৌক্তিক ও অসম্ভব। অবশ্য আমাদের মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয় তথা মেধা ও অনুভূতি হয়ত সেটা অনুধাবন করতে অক্ষম। বরং এ সকল বিষয়ে এমন হওয়াটাই জরুরী। যদি নবী–রাসূলগণ শুধু ঐ সকল কথাই বলেন, যা আমরা চিন্তা করে, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝতে সক্ষম হই, তাহলে তাদের নবী–রাসূলরূপে প্রেরিত হওয়ার প্রয়োজনই বা কি?

৫. আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম মৃত্যুপরবর্তী জীবন, অর্থাৎ কবর জগত ও আখেরাত সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তার মধ্যে একটি বিষয়ও এমন নেই যা অযৌক্তিক ও অসম্ভব। ঐ সকল বিষয়ের মধ্যে এমন বিষয় অবশ্যই আছে যা আমরা নিজস্ব চিন্তা–ভাবনা ও বুদ্ধি–বিবেক দ্বারা নিজে নিজে অনুধাবন করতে পারি না। এ দুনিয়ায় সে সকল বিষয়ের কোন নমুনা না থাকার কারণে এ দুনিয়ার অন্যান্য অনুভূত বিষয়ের ন্যায় সেগুলো বুঝতেও পারি না।

৬. ইলম হাসিল করার জন্য সাধারণ ও প্রাকৃতিকভাবে আমাদেরকে যে সকল মাধ্যম ও উপকরণ দান করা হয়েছে, যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও বুদ্ধি–বিবেক, এগুলোর সব ক'টির কার্যপরিধি ও ক্ষমতা একান্তই সীমিত। আমরা এটাও দেখি যে, নব আবিস্কৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে এমন অনেক বিষয়ই আমরা জানতে পারি, যা পূর্বে কখনো কল্পনাও করা যায়নি। যেমন পানি বা রক্তে সৃষ্ট জীবাণু খালি চোখে যা দৃষ্টিগোচর হওয়া একেবারেই অসম্ভব, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা তা দেখতে পাই। রেডিওর সাহায্যে হাজার হাজার মাইল দূরের শব্দও আমাদের কান শুনতে পারে। সাধারণ লোকেরা ইন্দ্রিয়প্রসূত অভিজ্ঞতার আলোকে যা অনুধাবন করতে পারে, শিক্ষিত লোকেরা কিতাব পড়ে তার চেয়ে অনেক বেশী অনুধাবন করতে সক্ষম হন।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা জানা গেলো যে, কোন বিষয়কে কেবলমাত্র এজন্য অস্বীকার করা যে, আমরা আজ তা দেখতে পাই না, শুনতে পাই না, অথবা আমাদের মেধা তা অনুধাবন করতে পারে না, এটা নিতান্তই বোকামী। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন—

وَ مَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلاً (سورة بنى اسرائيل ٨٥)

অর্থাৎ তোমাদেরকে সামান্যই ইলম দান করা হয়েছে।

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৮৫)

৭. মানুষ দুটি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত। এক, শরীর যা প্রকাশ্য ও দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বিতীয়, রূহ বা আত্মা, যদিও আমরা রূহকে চোখে দেখি না কিন্তু তার অস্তিত্ব আমরা সবাই স্বীকার করি। এ দুনিয়াতে মানুষের এই দুই অংশের পরস্পর সম্পর্ক এরূপ যে, মানুষের উপর দুঃখ–কষ্ট, শান্তি ও আরামের যে অবস্থা আপতিত হয় তা শরীরের উপর প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়। আর রূহ শরীরের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তা অনুভব করে। যেমন কোন মানুষ আঘাত লেগে আহত হলো, অথবা আগুনে জ্বলে গেলো। এ ক্ষেত্রে আঘাত বা আগুনের সম্পর্ক যদিও সরাসরি তার দেহের সাথে, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় রূহও কষ্ট পায়। তদ্রূপ পানাহারের যে স্বাদ পাওয়া যায়, সেটাও সরাসরি শরীরই লাভ করে থাকে, কিন্তু এতে রূহও তৃপ্ত হয়।

মোটকথা, মানুষের দুনিয়াবী হালাত ও পার্থিব জীবনে শরীরই আসল, আর রূহ তার অধীন। কিন্তু কুরআন ও হাদীছে কবর–জগত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝে আসে যে, সেখানকার ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ, মানুষের সেখানকার জীবনে যে সুখ–দুঃখ ও ভাল–মন্দ অবস্থা আপতিত হবে তা মূলতঃ সরাসরি

রূহের উপরেই বর্তাবে। আর শরীর পরোক্ষভাবে তা অনুভব করবে। এ ব্যাপারটি অনুধাবন করা যেন আমাদের জন্য সহজ হয়, আল্লাহ পাক সম্ভবতঃ এ জন্যই এ দুনিয়াতেও তার একটি নমুনা রেখেছেন। আর তাহলো, স্বপ্ন। বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষই তার জীবনে এমন স্বপ্ন একাধিক বার দেখে থাকে যাতে তার খুবই মজা লাগে এবং আনন্দ লাভ হয়। অথবা খুবই কষ্ট লাগে, মারাত্মক দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু স্বপ্নের এই দুঃখ-কষ্ট বা আরাম-আয়েশ প্রত্যক্ষভাবে রূহের উপর আপতিত হয়। আর দেহ রূহের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তা অনুভব করে। অর্থাৎ স্বপ্নে যখন কেউ দেখে যে, সে খুবই মজাদার খাবার খাচ্ছে তখন সে শুধু নিজ রূহ ও কল্পনা শক্তিকে খেতে দেখে না, বরং সে দেখে যে জাগ্রত অবস্থার মতই সে তার ঐ শারীরিক মুখ দিয়ে খাচ্ছে, যে মুখ দিয়ে দুনিয়াতে সে প্রতিদিন খানা খায়। তদ্রূপ যদি কেউ স্বপ্নে এ দৃশ্য দেখে যে, কেউ তাকে প্রহার করলো, তাহলে সে এটা দেখে না যে, তার রূহকে প্রহার করা হলো, বরং সে স্বপ্নে এ দৃশ্যই দেখে যে, প্রহার তার দেহের উপরই পতিত হচ্ছে। সে সময়ও তার শরীরে ঐ রকম আঘাতই লাগে যেরূপ আঘাত জাগ্রত অবস্থায় প্রহারের দরুন শরীরে লাগে। অথচ স্বপ্নের সময় যা কিছু হয় তা সরাসরি রূহের উপরেই সংঘটিত হয়ে থাকে। শরীর পরোক্ষভাবে তা অনুভব করে। অবশ্য স্বপ্নের সময় শরীরে পরোক্ষভাবে পতিত আঘাত কখনো কখনো এত বেশী অনুভূত হয়ে থাকে যে, মানুষ স্বপ্ন ভেঙ্গে জাগ্রত হওয়ার পর শরীরে তার চিহ্ন ও প্রতিক্রিয়া দেখতে পায়।

মোটকথা, ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ ভাল বা মন্দ স্বপ্ন দেখে যে সুখ বা দুঃখ অনুভব করে তার অবস্থা এই যে, সেগুলো মূলতঃ সরাসরি রূহের উপর সংঘটিত হয় এবং পরোক্ষভাবে শরীরের উপরও তার আছর হয়। এ কারণেই স্বপ্নদ্রষ্টার অতি নিকটে

উপস্থিত ব্যক্তিও তার শরীরের উপর কোন কিছু সংঘটিত হতে দেখে না। আসল কথা এই যে, আমরা দুনিয়াতে কেবলমাত্র মানুষের ঐ সকল অবস্থাই দেখতে সক্ষম, যার সম্পর্ক সরাসরি দেহের সাথে। সুতরাং 'আলমে বরযখে' (অর্থাৎ মৃত্যুর পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ে) মানুষের (নেক আমল ও বদ আমলের দরুন) যা কিছু হবে তাও এ প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সেগুলো মূলতঃ সরাসরি রূহের উপরই সংঘটিত হবে আর দেহ তার প্রভাবে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হবে। আলমে বরযখ তথা কবর জগতের ঘটনাকে স্বপ্নের অভিজ্ঞতার আলোকে অনুধাবন করা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

উপরোক্ত আলোচনার পর আশা করা যায় যে, এ দুনিয়ার ঘটনাবলী ও কবর জগতের অবস্থা ও ঘটনাবলীর পার্থক্য বুঝে আসবে এবং কবরের প্রশ্নোত্তর, আযাব, হাশর, হিসাব-কিতাব, পুলসিরাত ও বেহেশত-দোযখ সম্পর্কে ইসলামী আকীদা ও শিক্ষা সম্পর্কে দুর্বল ঈমান ও নির্বোধ লোকদের মত অহেতুক কোন সংশয় ও প্রশ্ন জাগ্রত হবে না।

(মাআরেফুল হাদীছ, ১ম খণ্ড, ১৮৬-১৮৯ পৃঃ)

নিম্নে আমরা হাদীছের আলোকে সংক্ষিপ্তাকারে মৃত্যু ও তার পরবর্তী জীবনের (অর্থাৎ কবর জগতের) অবস্থা সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক আকীদা ও শিক্ষা পেশ করছি, যাতে সহজেই আখিরাত সম্পর্কে আমাদের ঈমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে—

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বলেন, আমরা একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আনসারীদের মধ্যে এক ব্যক্তির জানাযায় গেলাম। আমরা কবরের নিকট গেলাম, কিন্তু তখনো কবর খোঁড়া হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে গেলেন এবং আমরাও তাঁর আশেপাশে বসে গেলাম, যেমন আমাদের মাথায় পাখী বসেছে (অর্থাৎ চুপচাপ)। তখন হুযূরের হাতে একটি কাঠের টুকরো ছিল, যদ্দ্বারা তিনি (চিন্তিত ব্যক্তির ন্যায়) মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন ঃ আল্লাহর নিকট কবরের আযাব থেকে পানাহ চাও। তিনি তা দুই কি তিন বার বললেন। তারপর বললেন, মুমিন বান্দা যখন দুনিয়াকে ত্যাগ করতে এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হতে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসেন, তাদের চেহারা যেন সূর্য। তাদের সঙ্গে বেহেশতের কাফনসমূহের একটি কাফন (কাপড়) থাকে এবং বেহেশতের খুশবুসমূহের (মধ্য হতে) এক রকম খুশবু থাকে। তাঁরা তার নিকট থেকে দৃষ্টির সীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল মঊত (আযরাঈল আঃ) তার নিকটে আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসে বলেন, হে পবিত্র রূহ! বের হয়ে এস আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষের দিকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন তার রূহ বের হয়ে আসে যেমন মশক হতে পানি বের হয়ে আসে (অর্থাৎ সহজে)। তখন মালাকুল মঊত তা গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না ; বরং ঐ সকল অপেক্ষমান ফেরেশতা এসে তাকে গ্রহণ করেন এবং ঐ কাফন ও ঐ খুশবুতে রাখেন। তখন তা থেকে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত খুশবু অপেক্ষা উত্তম মেশকের খুশবু বের হতে থাকে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাকে নিয়ে ফেরেশতারা উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তারা ফেরেশতাদের মধ্য হতে কোন ফেরেশতাদলের নিকটে পৌঁছেন তখন তারা জিজ্ঞাসা করেন, এই পবিত্র রূহ কার? তখন

ফেরেশতারা দুনিয়াতে তাকে লোকেরা যে সকল উপাধি দ্বারা ভূষিত করত, সে সকলের মধ্য থেকে উত্তমটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, এ অমুকের পুত্র অমুকের রূহ, যাবৎ না তারা তাকে নিয়ে প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌছেন (এরূপ প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে)। অতঃপর তারা আসমানের দরজা খুলতে চান, আর অমনি তাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফেরেশতারা তাদের পশ্চাৎগামী হন পরবর্তী উপরের আসমান পর্যন্ত—যাবৎ না তারা সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌছেন। এ সময় আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমার বান্দার ঠিকানা 'ইল্লিয়্যীনে' লিখ এবং তাকে (তার কবরে) যমীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা, আমি তাদেরকে যমীন থেকে সৃষ্টি করেছি এবং যমীনের দিকেই তাদের প্রত্যাবর্তন করব, অতঃপর যমীন থেকে আমি তাদেরকে পুনরায় (হাশরের মাঠে) বের করব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুতরাং তার রূহ্ তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

অতঃপর তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব কে? তখন সে উত্তর দেয়, আমার রব আল্লাহ্। অতঃপর (ফেরেশতারা) জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? তখন সে বলে, আমার দ্বীন ইসলাম। আবার তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে উত্তর করে, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পুনরায় তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি একথা কি করে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, অতঃপর তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আসমানের দিক থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং

তার জন্য বেহেশতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে বেহেশতের একটি লেবাস পরিয়ে দাও। এ ছাড়া তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন তার প্রতি বেহেশতের সুখ–শান্তি ও বেহেশতের খুশবু আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবরকে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তার নিকট এক সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসে এবং তাকে বলে, তোমাকে সন্তুষ্টি দান করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই দিবসেরই তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? তোমার চেহারা তো দেখার মতো চেহারা, যা কল্যাণের বার্তা বহন করে। তখন সে বলে, আমি তোমার নেক আমল। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! কিয়ামত কায়েম কর! হে আল্লাহ! কিয়ামত কায়েম কর, যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের দিকে যেতে পারি (অর্থাৎ হূর, গিলমান ও বেহেশতী সম্পদ তাড়াতাড়ি পেতে পারি)।

পক্ষান্তরে, কাফের বান্দা যখন দুনিয়া ত্যাগ করতে ও আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন তার নিকট আসমান হতে একদল কাল চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতা অবতীর্ণ হন, যাদের সাথে শক্ত চট থাকে। তাঁরা তার নিকট থেকে দৃষ্টি সীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল মউত আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসেন, অতঃপর বলেন, হে খবীছ (অপবিত্র) রূহ! বের হয়ে আস্ আল্লাহর ক্রোধের দিকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ সময় রূহ ভয়ে তার শরীরের এদিক সেদিক পালাতে থাকে। তখন মালাকুল মউত তাকে টেনে বের করেন, যেমন লোহার গরম শলাকা ভিজা পশম থেকে টেনে বের

করা হয় (আর তাতে পশম লেগে থাকে)। তখন তিনি তাকে গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন গ্রহণ করেন, মূহূর্ত কালের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না ; বরং অপেক্ষমান ফেরেশতারা তাড়াতাড়ি তাকে সেই চটে জড়িয়ে নেন। তখন তা থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে—পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ অপেক্ষা অধিক দুর্গন্ধযুক্ত। ওকে নিয়ে তারা উপরে উঠতে থাকেন। কিন্তু যখনই তাঁরা তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের কোন দলের নিকট পৌঁছেন, তারা জিজ্ঞেস করেন, এই খবীছ রূহ কার? তখন তারা তাকে দুনিয়াতে যে সকল খারাপ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হত, সেগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, অমুকের পুত্র অমুকের, যাবৎ না তাকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দিতে চাওয়া হয় ; কিন্তু খুলে দেওয়া হয় না। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমর্থনে কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ
الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ – (سورة الاعراف ٤٠)

অর্থাৎ "তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না এবং তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে।" (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ৪০)

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, তার ঠিকানা 'সিজ্জীনে' লেখ, যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে।

সুতরাং তার রূহকে যমীনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সমর্থনে এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ
الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ - (سورة الحج ٣١)

অর্থাৎ, "যে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করেছে, সে যেন আকাশ থেকে পড়েছে,অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে অথবা ঝঞ্ঝা তাকে বহু দূরে নিক্ষেপ করেছে।" (সূরা হজ্জ, আয়াত ৩১)

সুতরাং তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, হায়, হায়, আমি জানি না। অতঃপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলে, হায়, হায়, আমি জানি না। তৎপর জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছেন, তিনি কে? সে বলে, হায়, হায়, আমি জানি না। এ সময় আকাশের দিক থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা বলেছে, সুতরাং তার জন্য দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং দোযখের পোশাক পরিয়ে দাও এবং দোযখের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। সুতরাং তার দিকে দোযখের উত্তাপ ও লু আসতে থাকে এবং তার কবর তার প্রতি এত সংকুচিত হয়ে যায়, যাতে তার এক দিকের পাঁজর অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট একটা অতি কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট নোংরাবেশী দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসে ও বলে, তোমাকে দুঃখিত করবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর। এই দিবস সম্পর্কেই (দুনিয়াতে) তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হতো। তখন সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? কী কুৎসিত তোমার চেহারা, যা মন্দ সংবাদ বহন করে। সে বলে, আমি তোমার বদ আমল। তখন সে বলে, হে খোদা! কিয়ামত কায়েম করো না। (তখন আমার উপায় থাকবে না।)

(মুসনাদে আহমাদ ঃ ৪/২৮৭-৮৮ পৃঃ)

আমরা বইটিকে অনুবাদ ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি, তা সত্ত্বেও কিছু ভুল–ত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুতরাং সুধী পাঠকের দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ রইল। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করবো।

পরিশেষে এই সুন্দর বইটি প্রকাশের মুহূর্তে আমার দু'জন হিতাকাংখীর কথা উল্লেখ না করলে চরম অকৃতজ্ঞতা হবে। তাঁদের প্রথমজন হলেন, আমার সন্তানদের মামা জনাব মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ মাসীহুর রহমান ছাহেব, যিনি পাকিস্তান থেকে মূল বইটি এনে অনুবাদ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অপরজন হলেন, আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী জনাব প্রফেসর মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ ছাহেব, যিনি মারাত্মক অসুস্থতায় শয্যাশায়ী হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ বইটির একটি প্রুফ দেখে দিয়ে অনেক অসংগতি দূর করে দিয়েছেন। আমি উভয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আল্লাহ পাক উভয়কে উত্তম বিনিময় দান করুন।

বইটি পাঠ করে যদি কারো মধ্যে মৃত্যু ও কবর জগত সম্পর্কে চেতনা সৃষ্টি হয় এবং তিনি আত্মশুদ্ধির পথে অগ্রসর হন, তাহলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলে পরকালের সঠিক পাথেয় সংগ্রহ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

নিবেদক—

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান খান
জামি'আ ইসলামিয়া, ঢাকা।
২৫শে জিলকদ, ১৪২১ হিজরী

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

দুনিয়ার ওপারে

পর্ব–১ ১৭
অন্ধকারাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম ২১
এক মহিলার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ২২
দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ২৩
মৃত আত্মীয়–স্বজন ও বন্ধু–বান্ধবের দর্শন লাভ ২৩
নূরানী মাখলুকের অস্তিত্ব ২৪

পর্ব–২ ২৬
এক মহিলার বিস্ময়কর কাহিনী ২৬
আরেক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ২৮
একটি বাধা ২৯
শিশুদের অভিজ্ঞতা ৩০
দোযখের মত ৩১
এ সকল জিনিসের হাকীকত বা তাৎপর্য কি? ৩২

পর্ব–৩ ৩৪
মেডিকেল সাইন্সের অক্ষমতা ৩৫
মৃত্যুর হাকীকত ৩৫
জীবন ও মৃত্যু ৩৬
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ৪১

মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি

মৃত্যু একটি অপরিহার্য বিষয় ৪৮
মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের অর্থ ৪৮
আমাকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে ৪৯
দুটি বড় নেআমত সম্পর্কে গাফলতী ৫০

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত বাহলুল (রহঃ)এর নসীহতমূলক ঘটনা	৫২
বুদ্ধিমান কে?	৫৪
আমরা সবাই নির্বোধ	৫৫
মৃত্যু ও আখেরাতের চিন্তা করার পদ্ধতি	৫৬
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু নু'আম (রহঃ)এর কাহিনী	৫৭
আল্লাহ পাকের সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ	৫৮
আজই নিজের হিসাব নাও	৫৯
সকালে নফসের (মনের) সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে	৬০
নফসের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া	৬০
চুক্তির পর দু'আ করা	৬১
সারাদিন আমলের মুরাকাবা	৬১
ঘুমানোর পূর্বে 'মুহাসাবা' (হিসাব নেওয়া)	৬২
অতঃপর শোকর আদায় করা	৬২
অন্যথা হলে তাওবা করো	৬৩
নিজের উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন	৬৩
শাস্তি উপযোগী ও মধ্যম ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয়	৬৪
কিছুটা হিম্মত করতে হবে	৬৫
এ আমল বরাবর করতে হবে	৬৫
হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)এর একটি কাহিনী	৬৬
অনুশোচনা ও তাওবা দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া	৬৭
নফসের সাথে সমগ্র জীবনব্যাপী লড়াই করতে হবে	৬৯
আল্লাহ তাআলাকেও কি এ উত্তর দিবে?	৭২
সাহস ও উদ্দীপনা আল্লাহ পাকের নিকটই চাও	৭২
তাঁর দয়ার কোন সীমা নেই	৭৪
আখেরাত ঃ পুরস্কার ও শাস্তি	৭৫

॥ ॥ ॥

দুনিয়ার ওপারে
পর্ব–১

মৃত্যুর পর কি হবে? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর একমাত্র পবিত্র কুরআন ও প্রামাণ্য হাদীছ শরীফের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ সত্যি সত্যি যে মৃত্যুবরণ করে, সে আর দুনিয়াতে ফিরে আসে না।

যেমন কবি বলেছেন ঃ

کاں را کہ خبر شد، خبرش باز نیا مد

অর্থাৎ যে ব্যক্তি (মূল তত্ত্বের) খবর পেয়েছে, তার খবর কেউ পায়নি।

কিন্তু কয়েক বছর পূর্বে আমি এমন একটি বই পড়েছিলাম, যে বইতে এমন লোকদের চিত্তাকর্ষক অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে, যারা মৃত্যুর প্রান্তদেশে পৌঁছে ফিরে এসেছে। তারা মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যা কিছু দেখেছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। বইটির নাম হলো Life After Life (পরপারের জীবন) বইটি লিখেছেন আমেরিকার ডঃ রেমণ্ড এ মোদী (Ramond A Moodi)। ডঃ মোদী প্রথমে দর্শন শাস্ত্রে পিএইচডি করেছেন, পরবর্তীতে তিনি মেডিক্যাল সাইন্সের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন। দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও মেডিসিন বিষয়ে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি রয়েছে।

ডঃ মোদী সর্বপ্রথম ডঃ জর্জ রাচী নামক একজন মনস্তত্ত্ববিদ সম্পর্কে জানতে পারেন যে, তিনি যখন মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত অবস্থায় মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যান (এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার

উপক্রম হয়) তখন ডাক্তাররা কৃত্রিম হৃদযন্ত্রসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করত তাঁকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা (Resuscitation) করেন। এতে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরে আসে এবং তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। সুস্থ হওয়ার পর তিনি বর্ণনা করেছেন যে, যখন ডাক্তাররা তাঁকে মৃত মনে করেছিল তখন তিনি অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন।

ডঃ মোদী এ ধরনের আরো কিছু ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন। অতঃপর তিনি খুব গুরুত্বের সাথে এ ধরনের লোক সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে থাকেন এবং তাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এ ধরনের প্রায় দেড়শত লোকের সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর তিনি এ বই রচনা করেন। এই বই যখন প্রকাশিত হয়, তখন এক বছরেই এর ত্রিশ লক্ষাধিক কপি বিক্রি হয়।

ডঃ মোদী বই লেখার পরও এ ব্যাপারে তাঁর গবেষণা ও অনুসন্ধান অব্যাহত রাখেন। ফলে এ বিষয়ে তিনি আরো কয়েকটি বই লিখেন। যার মধ্য হতে তিনটি বই আমি কয়েক বছর পূর্বে আমেরিকা থেকে ক্রয় করি। বইগুলোর নাম এই—

1. Life After Life
2. The Light Beyond
3. Reflection on Life After Life

এ নিবন্ধে আমি সামনে যা লিখছি তা এই তিনটি বই থেকে নেওয়া। এই তিনটি বইতে শুধুমাত্র সেই সকল লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যাদেরকে রোগের প্রচণ্ডতায় (Clinically Dead) মৃত ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু এ পরিস্থিতিতেও শেষ চেষ্টা হিসেবে ডাক্তাররা হৃদপিণ্ডে ম্যাসেজ এবং কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস অব্যাহত রাখার যে ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন, সে সকল ব্যবস্থা সফলতার সাথে এ সকল ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা হয়েছে, ফলে তাদের হুঁশ ফিরে এসেছে এবং তারা সুস্থ হয়েছে।

ডঃ মোদী বলেন, আমি যে সকল লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তারা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী এবং বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। তাদের সকলেই (মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে) যে সকল দৃশ্যাবলী অবলোকন করেছে, (তা নিজ নিজ ভাষায় ও) নিজ নিজ পন্থায় বর্ণনা করেছে। কেউ (অন্যের চেয়ে) কোন কথা বেশী বলেছে, কেউ (অন্যের তুলনায়) কোন কথা কম বলেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে যে কথাগুলো প্রায় তাদের সকলেরই (common elements) আলোচনায় এসেছে তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

> এক ব্যক্তি মৃত্যুর কাছাকাছি উপনীত, তার শারীরিক অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে, সে নিজেই শুনতে পেল যে, তার ডাক্তার তার মৃত্যুর কথা ঘোষণা করছেন। হঠাৎ সে একটি কষ্টদায়ক শব্দ শুনতে পেল। সাথে সাথে তার এমন অনুভূত হলো যে, সে অতি দ্রুতগতিতে দীর্ঘ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ অতিক্রম করছে। অতঃপর হঠাৎ সে অনুভব করল যে, সে তার দেহ থেকে বাইরে চলে এসেছে। সে দূরে দাঁড়িয়ে দর্শকের ন্যায় নিজ দেহ দেখতে লাগল। সে দেখতে পেল যে, সে নিজে একটি দর্শনীয় স্থানে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার দেহ আগের মতই খাটের উপর পড়ে আছে। ডাক্তাররা ঝুঁকে পড়ে তার বুকে ম্যাসেজ করছেন এবং কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করার চেষ্টা করছেন। সামান্য ক্ষণ পর সে তার অনুভূতিশক্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে বুঝতে পারল যে, এই নতুন অবস্থায়ও তার একটি শরীর আছে। কিন্তু তার বর্তমান শরীর পূর্বের ছেড়ে আসা শরীর থেকে ভিন্ন। তার বর্তমান শরীরের অবস্থাও অন্যরকম। তার শরীরের শক্তি অন্যরকম। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ পর সে তার মৃত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের দেখতে পেল। অতঃপর সে একটি নূরের সত্তা বা মাখলুক (Beign of Light) দেখতে পায়, সে সত্তা তাকে বলে যে, তুমি তোমার (বিগত) জীবনের হিসাব (খবর) নাও। তার এ কথা শব্দের মাধ্যমে না হয়ে অন্যভাবে

(Nonverbal) শ্রুত হয়। অতঃপর সেই নূরের সত্তা নিজেই ঐ ব্যক্তির সামনে তার জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এনে দ্রুত তাকে দেখাতে থাকে। এক পর্যায়ে সে তার সামনে একটি বাধা দেখতে পায়, যে বাধা সম্পর্কে সে নিজেই বুঝতে পারে যে, এটা তার দুনিয়ার জীবন এবং মৃত্যুর পরের জীবনের মাঝখানের সীমান্ত (বর্ডার)। ঐ সীমান্তের নিকট পৌঁছে সে জানতে পারে যে, এখন তাকে দুনিয়ায় ফিরে যেতে হবে। এখনো তার মৃত্যুর সময় হয়নি। এরপর সে অজ্ঞাত পন্থায় তার ঐ (পূর্ব) শরীরে ফিরে আসে, যা সে খাটের উপর ছেড়ে গিয়েছিল। সুস্থ হওয়ার পর সে তার এ সকল অবস্থা অন্যকে জানাতে চায়, কিন্তু প্রথমতঃ তার ঐ অবস্থা (পরিপূর্ণরূপে) বর্ণনা করার জন্য মানুষের ব্যবহৃত সকল শব্দভাণ্ডার অপ্রতুল মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ যখন সে এ সকল কথা মানুষকে বলে তখন তারা তাকে বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করে। এজন্য সে নিশ্চুপ থাকে।

ডঃ মোদী তাঁর বইতে দেড়শত ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের এ সারসংক্ষেপ বর্ণনা করার পর একথা বলেন যে, আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, দেড়শত ব্যক্তির মধ্যে সকলেই পরিপূর্ণ ঘটনা এই ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণনা করেছে। বরং তিনি বলেন, কেউ কেউ এই পূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করেছে, আবার কেউ কেউ এ কাহিনীর কিছু অংশ বর্ণনা করেছে এবং কিছু অংশ বাদ দিয়েছে। কারো কারো বর্ণনাধারা একরকম ছিল, কারো অন্যরূপ। আসলে ঐ অবস্থা পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য অধিকাংশ লোক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ও ভিন্ন ভিন্ন বাচনভঙ্গি অবলম্বন করেছে। অবশ্য একথা প্রায় সকলেই বলেছে যে, আমরা (সে সময়ে) যা কিছু দেখেছি সেসব বিষয় ভাষায় প্রকাশ করা আমাদের জন্য খুবই কঠিন।

একজন মহিলা তার সে সময়ের অবস্থাকে (যা সাধারণ ভাষায় বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব) কিছুটা দার্শনিক ভাষায় এভাবে প্রকাশ করেছে—

আমি যখন আমার সে সময়ের অবস্থা আপনার নিকট বর্ণনা করতে চাই, তখন আমার একটি সমস্যা হলো, আমার যত শব্দ জানা আছে, তার সবই তিন দূরত্ব বিশিষ্ট (Three dimensional) (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা ও বেধ এর খাঁচায় আবদ্ধ)। আমি এ পর্যন্ত জিওমেট্রির (Geometri) মাধ্যমে পড়েছি যে, পৃথিবীতে দূরত্ব মাত্র তিনটি, কিন্তু আমাকে মৃত ঘোষণা করার পর আমি যা কিছু দেখেছি, তাতে বুঝতে পেরেছি যে, (সে জগতে) তিনের অধিক দূরত্ব বিদ্যমান। এজন্যই সে অবস্থা পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। কারণ হলো, এখন আমাকে সে অবস্থা তিন দূরত্ব বিশিষ্ট শব্দ ভাণ্ডারের সাহায্যে বর্ণনা করতে হবে, যা আমার জন্য খুবই দুঃসাধ্য।

মোটকথা, ঐ সকল (মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা) মানুষ যে সকল দৃশ্য ও অবস্থার কথা বর্ণনা করেছে ওদের মধ্যে কয়েকটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—

১. অন্ধকারাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ।

২. শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

৩. মৃত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের দর্শন লাভ।

৪. একটি নূরানী সত্তা বা মাখলুকের অস্তিত্ব।

৫. নিজ নিজ জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী অবলোকন করা।

এ সকল বিষয়ের যে বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন জন দিয়েছে, তার কিছু নির্বাচিত অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। আশা করি এ সকল অংশ পাঠক সমাজের জন্য চিত্তাকর্ষণের কারণ হবে—

অন্ধকারাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম

অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করার অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছে যে, আমি একটি অন্ধকার শূন্যস্থানে সাঁতার কাটছিলাম। কেউ বলেছে যে,

এটা ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল। কেউ এটাকে অন্ধকার গুহা নাম দিয়ে বলেছে যে, আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছি। কেউ এটাকে একটি কূপের ন্যায় বলেছে। আবার কারো মতে এটি একটি অন্ধকার প্রান্তর ছিল। কেউ বলেছে যে, অন্ধকারের মধ্যে উপরের দিকে উঠে আসছিলাম। অবশ্য একথা সকলেই বলেছে যে, মানুষের ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার ঐ অবস্থাকে যথাযথরূপে বর্ণনা করার জন্য একেবারেই অপ্রতুল।

যে অবস্থাটাকে সকলেই অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে বর্ণনা করেছে, তা হলো, নিজ দেহ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া।

এক মহিলার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা

এক ভদ্র মহিলা একবার মারাত্মকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। সে তার অভিজ্ঞতার কথা এভাবে বর্ণনা করে—

আমি যখন হৃদরোগে আক্রান্ত হই তখন হঠাৎ আমার মনে হলো যে, আমার হৃদস্পন্দন (heart beat) বন্ধ হয়ে গেছে। আমি যেন পিছলে আমার দেহ থেকে বাইরে চলে যাচ্ছি। প্রথমে আমি বিছানায় পৌঁছলাম, অতঃপর ধীরে ধীরে ক্রমশঃ উপরে উঠতে থাকলাম, এমনকি ছোট্ট কাগজের টুকরোর ন্যায় উড়ে গিয়ে ছাদে ঠেকে গেলাম। সেখান থেকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম যে, আমার দেহ নীচে বিছানায় পড়ে আছে, ডাক্তার ও নার্সরা (আমার পড়ে থাকা) দেহের উপর তাদের শেষ ব্যবস্থা প্রয়োগ করছে। প্রচেষ্টারত নার্সদের একজন হঠাৎ বলে উঠল, হায় আল্লাহ! এতো শেষ হয়ে গেছে! অপর একজন নার্স আমার সেই দেহের মুখে নিজ মুখ লাগিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখার চেষ্টা করছে। আমি তার গর্দান পিছন দিক থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। তার চুলের কথা আমার এখনো মনে আছে। অতঃপর একটি মেশিন এনে আমার বক্ষকে স্পন্দিত করা হলো, আমি আমার দেহকে কম্পিত হতে দেখতে লাগলাম।

দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া

নিজ দেহ থেকে পৃথক হওয়ার এ অবস্থাটাকে কেউ কেউ এভাবে বর্ণনা করেছে যে, আমরা এমন নতুন অস্তিত্ব লাভ করেছিলাম, যা শরীর ছিল না।

কেউ কেউ বলেছে যে, এটাও অন্য ধরনের দেহ ছিল, যা অন্যদেরকে দেখতে সক্ষম ছিল, কিন্তু তাকে অন্যেরা দেখতে পেত না।

ঐ অবস্থায় কেউ কেউ তাদের সামনে উপস্থিত ডাক্তার ও নার্সদের সঙ্গে কথা বলারও চেষ্টা করেছে, কিন্তু ডাক্তার ও নার্সরা তাদের কথার আওয়াজ শুনতে পায়নি। তারা ঐ ওজনহীন হালকা অবস্থায় শুধুমাত্র শূন্যস্থানে হাওয়ার উপর সাঁতার কাটত তাই নয় বরং তারা সে অবস্থায় যখন কোন জিনিস স্পর্শ করার চেষ্টা করত, তখন তা ভেদ করে চলে যেত।

অনেকে এমনও বলেছে যে, সে অবস্থায় সময়ের গতি থেমে গিয়েছিল, ফলে আমরা অনুভব করছিলাম যে, আমরা সময়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছি।

মৃত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের দর্শন লাভ

ঐ মৃতপ্রায় অবস্থায় অনেকেই তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের দর্শন লাভ করেছে। অনেকে এ কথাও বলেছে যে, আমরা সে সময় অনেক বিভ্রান্ত রূহ/প্রাণ দেখেছি। এ সকল রূহের/প্রাণের আকৃতি যদিও প্রায়ই মানুষের আকৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল কিন্তু মানুষের আকৃতি হতে কিছুটা ভিন্নতর ছিল। এক ব্যক্তি এ সকল রূহের/প্রাণের বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছে—

> ঐ সকল রূহ বা প্রাণের মাথা নীচের দিকে ঝুঁকে ছিল, তাদেরকে দেখে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যথিত মনে হচ্ছিল। তাদের

একজনকে অপরজনের সাথে এমনভাবে আটকানো মনে হচ্ছিল, যেমন শিকলে বাধা একটি দল। আমি তাদের পা কখনো দেখেছি কি না, তা আমার স্মরণে নেই। আমি জানি না তারা আসলে কি। তাদের রং একেবারে ফ্যাকাশে ছিল। তারা একেবারে মত্ত–বিভোর ছিল। তাদের রং কিছুটা মেটে ছিল। এমন মনে হচ্ছিল যে, তারা একে অপরের সাথে আটকানো অবস্থায় শূন্যে চক্কর কাটছে। তারা যেন বুঝতেই পারছে না যে, তাদের কোথায় যেতে হবে। তারা একদিকে চলতে আরম্ভ করে, একটু পরেই বাম দিকে ঘুরে যেত, আবার কয়েক কদম চলেই ডানদিকে ঘুরে যেত, আবার অন্যদিকে চলতে শুরু করত। আসলে তারা কোন কাজই করত না। এমন মনে হত যেন তারা কোন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তারা কি খুঁজে ফিরছে তা আমার জানা নেই। এমন মনে হত যেন তারা নিজেদের সম্পর্কেও কিছু জানে না যে, তারা কে। এবং কি। তাদের কোন পরিচয় ছিল না। কোন কোন সময় এমনও মনে হয়েছে যে, তাদের মধ্য থেকে কেউ কিছু বলতে চায় কিন্তু বলতে পারে না।

(Reflection, p. 19)

নূরানী মাখলুকের অস্তিত্ব

ডঃ মোদী যত লোকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন, তাদের অধিকাংশই সেই মৃতপ্রায় অবস্থায় একটি নূরানী সত্তা/মাখলুকের (Being of Light) অস্তিত্বের কথাও অবশ্যই উল্লেখ করেছেন। তারা ঐ নূরানী মাখলুক সম্পর্কে বলেছেন যে, তাকে (নূরানী মাখলুক) দেখে তো এ কথাটি নিশ্চিতরূপে জানা হয়েছিল যে, এটা কোন কিছুর অস্তিত্ব, কিন্তু তার কোন শরীর ছিল না, উহা একান্তই একটি নূর, একটি আলো। প্রথম প্রথম ঐ আলো হালকা মনে হলেও ধীরে ধীরে তা তীব্র হতে থাকত। কিন্তু তার অস্বাভাবিক তীব্রতা সত্ত্বেও তা দ্বারা চোখ ঝলসে যেত না।

অনেকেই বলেছেন যে, ঐ নূরানী মাখলুক তাদেরকে বলেছেন, তোমরা তোমাদের জীবনের হিসাব নাও। অনেকে তার আরো কিছু কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, ঐ নূরানী মাখলুক যা কিছু বলেছে, তা (মানুষের ব্যবহৃত) ভাষা ও শব্দের মাধ্যমে নয়। অর্থাৎ ঐ নূরানী মাখলুকের কোন শব্দ তারা শুনতে পায়নি। বরং (কথোপকথনের) এটা একটা বিরল পদ্ধতি ছিল। ঐ বিরল পদ্ধতিতে (কোন ভাষা ও শব্দ ছাড়াই) তার বক্তব্য নিজে নিজেই আমাদের ধারণায় পরিবর্তিত হত, আমাদের মস্তিস্কে এসে যেত। যে সকল লোক ঐ দেহহীন অবস্থায় একটি 'নূরানী মাখলুক' প্রত্যক্ষ করার কথা বলেছে, তাদের অধিকাংশই বলেছে যে, ঐ নূরানী মাখলুক আমাদের নিকট আমাদের বিগত জীবন সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছে। প্রশ্নের শব্দ একেক জন একেক রকম বলেছে। কিন্তু সকলেই প্রশ্নের সারমর্ম প্রায় একথা বলেছে যে, তোমাদের নিকট আমাকে দেখানোর মত তোমাদের বিগত জীবনের কি জিনিস আছে?

What do you have to show me that you have done with your life.

তারা একথাও বলেছে যে, অতঃপর ঐ নূরানী মাখলুক এক এক করে আমাদের বিগত জীবনের ঘটনাবলী আমাদেরকে দেখাতে শুরু করল। বিগত জীবনের ঘটনাবলী কিভাবে দেখাল? এর বিবরণ আরো আকর্ষণীয়। সেই বিবরণ ইনশাআল্লাহ আমি আগামী সপ্তাহে বর্ণনা করব। সাথে সাথে এ সকল ঘটনার ব্যাপারে আমার অভিমতও ব্যক্ত করব।

দুনিয়ার ওপারে

পর্ব-২

গত সপ্তাহে আমি আমেরিকার ডঃ রেমণ্ড এ মোদীর বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে ঐ সকল লোকের কিছু অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করেছিলাম, যারা মারাত্মক অসুখ কিংবা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে ফেরত এসেছিল। ঐ সকল লোকের অনেকেই একথা বলেছে যে, তারা একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করার পর একটি অভূতপূর্ব আশ্চর্যজনক নূরানী মাখলুক দেখতে পায়। সেই নূরানী মাখলুক ঐ সকল লোককে তাদের বিগত জীবন সম্পর্ক জিজ্ঞাসাবাদ করে, অতঃপর সে নিজেই মুহূর্তের মধ্যে তাদের বিগত জীবনের সকল ঘটনাবলী এক এক করে দেখিয়ে দেয়।

এক মহিলার বিস্ময়কর কাহিনী

একজন মহিলা তার নিজের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলে—

> "যখন আমি সেই নূরানী মাখলুক দেখি, তখন সে সর্বপ্রথম আমাকে প্রশ্ন করে, 'আমাকে দেখানোর মত তোমার নিকট কি (আমল) আছে?' এ প্রশ্নের সাথে সাথেই আমার বিগত জীবনের ঘটনাবলী দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হচ্ছিলাম যে, এটা কি হচ্ছে! কারণ হঠাৎ আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি আমার শৈশবের একেবারে প্রারম্ভে পৌঁছে গেছি। এরপর আমার বর্তমান জীবনে আজ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সকল বছরের সকল ঘটনার দৃশ্য একত্রে আমার সামনে উপস্থিত হলো। আমি দেখতে পেলাম যে, আমি একটি ছোট মেয়ে, আমার বাসার কাছের একটি ঝর্ণার পাড়ে খেলাধুলা করছি। সেই শৈশবের অনেক ঘটনা, যা আমার বোনের সঙ্গে আমার

ঘটেছিল, সবই দেখতে পেলাম। আমার প্রতিবেশীদের সাথে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা দেখতে পাই। আমি (ছোট সময়ে যে কিণ্ডার গার্টেনে পড়াশোনা করেছি) নিজেকে সেই কিণ্ডার গার্টেনে দেখতে পাই। আমি ঐ সকল খেলনাও দেখতে পাই যা আমার খুবই প্রিয় ছিল কিন্তু আমি সেগুলো ভেঙ্গে ফেলেছিলাম এবং এর পর (মনে ব্যথা পেয়ে) অনেক কেঁদেছিলাম। কিছুদিন পর আমি 'গার্লস স্কাউট'এ অংশ নিয়েছিলাম (তাও দেখতে পাই)। আমার 'গ্রামার স্কুলে' পড়ার সময়ের ঘটনাবলী দেখতে পাই। এভাবে জুনিয়র হাই স্কুল, সিনিয়র হাই স্কুল এবং গ্রাজুয়েশন করা কালীন ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে করতে বর্তমান সময় পর্যন্ত এসে পৌঁছি।

সকল ঘটনা আমার সামনে ঐ ধারাবাহিকতায়ই আসছিল, যে ধারাবাহিকতায় তা ঘটেছিল। এ সকল ঘটনা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। ব্যাপারটি যেন এমন ছিল যে, তুমি একটু বাইরে এলেই তা দেখতে পাবে। এ সময় সকল ঘটনা পরিপূর্ণরূপে তিন দূরত্বে (Three dimension) আবদ্ধ ছিল। রংও দেখতে পাচ্ছিলাম। সেগুলো স্থির নয়, চলন্ত ছিল। যেমন, আমি যখন শৈশবে খেলনা ভাঙ্গার দৃশ্য দেখলাম, তখন সে সময় আমি যে যে ভাবে হাত–পা নাড়িয়ে তা ভেঙ্গেছিলাম সেভাবে হাত–পা নাড়তে দেখলাম।

যখন আমি এ সকল (বিগত জীবনের) ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলাম তখন ঐ নূরানী মাখলুককে দেখতে পাচ্ছিলাম না। সে একথা (তুমি কি? কি করেছ?) বলে দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও আমার অনুভূতি হলো, সে ঐ জায়গায় উপস্থিত আছে এবং সে এ সকল দৃশ্য দেখাচ্ছিল। এ কথা নয় যে, আমি আমার জীবনে কি কি করেছি, তা সে দেখতে চাচ্ছে,

বরং সে পূর্ব থেকেই এ সকল ব্যাপারে অবগত ছিল। এ সকল দৃশ্য দেখানোর পিছনে তার উদ্দেশ্য ছিল, আমি যেন এ সকল বিষয় স্মরণ করি। পুরো ব্যাপারটাই খুব আশ্চর্যজনক ছিল। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি বাস্তবিকই এ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলাম। এ সকল দৃশ্য অতি দ্রুতগতিতে আমার সামনে আসছিল। দ্রুতগতি সত্ত্বেও এতটুকু অবকাশ ছিল যে, (প্রতিটি বিষয়ই) পূর্ণরূপে অনুধাবন করা যেত। এত কিছু হওয়ার পরও সময় খুব বেশী ব্যয় হয়নি। আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। ব্যস! এমন মনে হচ্ছিল যে, একটি আলোর ঝলকানী এল, আর চলে গেল। এমন মনে হয় যে, এ সব ব্যাপার পাঁচ মিনিটের চেয়েও কম সময়ে ঘটে গেল। অবশ্য ত্রিশ সেকেণ্ডের চেয়ে বেশী সময় ব্যয় হয়েছে। কিন্তু (আসল কথা হলো) আমি আপনাকে যথাযথভাবে বলতে পারছি না।"

আরেক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা

অন্য এক ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার কথা এভাবে বর্ণনা করেছে—

"যখন আমি ঐ দীর্ঘ অন্ধকার জায়গা অতিক্রম করলাম, তখন ঐ সুরঙ্গের শেষ প্রান্তে আমার শৈশবের সকল কল্পনা, বরং পূর্ণ জীবনের সকল ঘটনাই সেখানে বিদ্যমান দেখতে পেলাম। একেবারে আমার সামনে আলোর ন্যায় চমকাচ্ছিল। এ সকল দৃশ্য ছবির সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল না। তবে আমার মতে কল্পনার সাথে এগুলোর সুসামঞ্জস্য ছিল। আমি ঐ অবস্থাটা আপনার নিকট বর্ণনা করতে অক্ষম। অবশ্য এটা ঠিক যে, আমার পুরো জীবন সেখানে বিদ্যমান ছিল। পুরো জীবনের সকল ঘটনা সেখানে একত্রে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। অর্থাৎ এমন নয় যে, একবার শুধু একটি জিনিস দেখেছি, অন্যবার অন্যটি, বরং

সকল জিনিসই এক সাথে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আমি আমার কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐ সকল অপকর্মও দেখতে পাচ্ছিলাম, যেগুলো করার পর আমার মনে হয়েছিল, হায়! যদি আমি এ সকল অপকর্ম না করতাম। যদি আমি ফিরে গিয়ে ঐ সকল বিষয় মিটিয়ে (undo) দিতে পারতাম। (Life After Life, p. 69)

একটি বাধা

যে সকল লোক ডঃ মোদীর নিকট নিজেদের এ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছে তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ এ কথাও বর্ণনা করেছে যে, ঐ ঘটনার শেষ পর্যায়ে তারা এমন একটি জিনিস দেখেছে যেন কোন একটি বাধা। অতঃপর এমনিতেই তাদের ধারণায় এসেছে অথবা তাদেরকে বলা হয়েছে যে, এ বাধা অতিক্রম করার সময় এখনো হয়নি। এর পরক্ষণেই তারা তাদের শরীরে ফিরে এসেছে। এভাবে তারা তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। কেউ কেউ বলেছে, এ বাধা একটি পানির ধারার মত ছিল। কেউ কেউ বলেছে, এটা মেটে রংয়ের বাধার মত ছিল। কেউ কেউ এটাকে দরজা বলে আখ্যায়িত করেছে। কেউ কেউ বলেছে, এটা ফসলের ক্ষেতের বেড়ার মত ছিল। আর কেউ কেউ বলেছে, এটা শুধু একটি রেখা ছিল।

ডঃ মোদীর এই বই (Life After Life) সর্বপ্রথম ১৯৭৫ ইংরেজী সনে প্রকাশিত হয়। প্রায় আট বছর কালব্যাপী দেড়শত লোকের সাক্ষাৎ নিয়ে তার সারাংশ ও ফলাফল তিনি এই বইতে লিখেছেন। সাথে সাথে তিনি একথা স্পষ্টভাবে লিখে দিয়েছেন যে, এখনো তার এ গবেষণাকে বৈজ্ঞানিক প্রমাণসিদ্ধ বলা যাবে না এবং তিনি এ সকল ঘটনার জরিপের (পূর্ণ) দায়িত্ব গ্রহণের মত পজিশনেও পৌঁছতে পারেননি। অবশ্য তার এই বই অন্য ডাক্তারদেরকে এ বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানোর প্রতি উৎসাহিত করেছে, যার দরুন তার পরে অনেকেই এ

সকল অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণকে নিজ গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং এ বিষয়ে আরো বই লিখেছেন।

শিশুদের অভিজ্ঞতা

ঐ সকল বইয়ের মধ্য থেকে একটি বই ডাঃ মেলভিন মোর্স (Melvin Morse) লিখেছেন, যা Closer to the Light নামে প্রকাশিত হয়েছে। ডাঃ মেলভিন মোর্স একজন শিশু বিশেষজ্ঞ। তিনি এ ব্যাপারে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন যে, শিশুরাও কি এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়? কারণ, তার ধারণা ছিল, বয়স্ক লোকেরা স্বীয় মস্তিস্কপ্রসূত কল্পনার আধিক্যে কিছু দৃশ্য দেখতে পারে। কিন্তু যেহেতু শিশুদের মস্তিস্ক এ ধরনের কল্পনামুক্ত হয়, তাই শিশুরাও যদি ঐ ঘটনা ও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, তাহলে এ সকল ঘটনার বাস্তবতা আরো দৃঢ় হবে।

এ বইতে তিনি লিখেছেন, অনেক শিশুও এ ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। লেখক নিজে ঐ সকল শিশুর সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের বর্ণনাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছেন। এ ব্যাপারে ডাঃ মেলভিনের অভিমত হলো, ঐ সকল শিশু মিথ্যা বলেনি। বাস্তবিকই তারা ঐ সকল দৃশ্য দেখেছে। ২৩৬ পৃষ্ঠার এই বইটি এ ধরনের বর্ণনা ও তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বলিত।

পলষ্টার জর্জ গ্যালাপ (Pollster Gearge Gallup) নামক আরেক ব্যক্তি সমগ্র আমেরিকায় এ ধরনের লোকদের (যারা উপরোক্ত অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে) মধ্যে জরিপ কাজ সম্পাদন করেছেন।

তার জরিপের ঘাবড়ে দেওয়ার মত সারাংশ এই যে, আমেরিকার মোট নাগরিকের মধ্যে প্রায় ৫% লোক মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে এ ধরনের দৃশ্য দেখেছে এবং এ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ডাঃ মোদীও তার গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন এবং এ প্রসঙ্গে The Light Beyond নামক আরেকটি বই লিখেছেন। এ বইতে তিনি লিখেছেন যে, (আমার পূর্বের

বই Light After Life–এ যে দেড়শ' জনের সাক্ষাৎকারের কথা লিখেছি) তাদের পর এ ধরনের আরো এক হাজার লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। এই এক হাজার লোকের বক্তব্যও প্রায় পূর্বের দেড়শ' জনের মতই ছিল, তবে এবার কিছু লোক নতুন কিছু তথ্যও দিয়েছে। যেমন পূর্বের দেড়শ' জনের কেউই বেহেশত ও দোযখের মত কোন কিছুর উল্লেখ করেনি, কিন্তু নতুন সাক্ষাৎকারের কয়েকজন লোক একটি 'অপূর্ব আলোর শহর' এর কথা উল্লেখ করেছে। কেউ কেউ 'মনোরম বাগান' দেখেছে এবং আলোচনা কালে তাকে জান্নাত বলে আখ্যায়িত করেছে। আবার কেউ কেউ স্পষ্টভাষায় দোযখের দৃশ্যাবলীর বর্ণনাও করেছে।

দোযখের মত

এক ব্যক্তি বলেছে, আমার মনে হলো আমি নীচে পতিত হচ্ছি। নীচে খুবই অন্ধকার। লোকেরা ভয়ানকভাবে চিৎকার করছিল। সেখানে ভয়াবহ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ছিল। সেখানকার লোকেরা পান করার জন্য আমার নিকট পানি চাচ্ছিল। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কি কোন সুড়ঙ্গ পথে নীচে পতিত হয়েছিলেন? তিনি উত্তরে বলেছেন, না! আমি কোন সুড়ঙ্গ পথে নীচে যাইনি, আমি যে রাস্তায় গিয়েছি, তা সুড়ঙ্গের চেয়ে প্রশস্ত ও বড় কোন জিনিস ছিল। আমি যেন সাঁতরে নীচে যাচ্ছিলাম। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, সেখানে কতজন লোক চিৎকার করছিল? তাদের শরীরে কি কোন কাপড় ছিল? উত্তরে সে বলেছে, তারা সংখ্যায় এত বেশী ছিল যে, আপনি গণনা করতে পারবেন না, আমার মনে হয় এক মিলিয়ন তো অবশ্যই হবে এবং তাদের শরীরে কোন কাপড় ছিল না।

(The Light Beyond, p. 26-27)

এ সকল জিনিসের হাকীকত বা তাৎপর্য কি?

এ সকল পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আসল হাকীকত কি? (এর উত্তরে বিভিন্নজন বিভিন্ন কথা বলেছেন।) কেউ কেউ মনে করেন, পাশ্চাত্যের লোকদের মধ্যে গোপন রহস্যভেদ ও আবিস্কারের আগ্রহ পাগলামী ও নেশার (Craze) পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে, এ সকল বই (ও তার বিষয়বস্তু) সেই পাগলামীরই বহিঃপ্রকাশ। যদিও এ সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু ১৯৭৫ সনের ডাঃ মোদীর বই Life After Life প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে (আজ পর্যন্ত) যেভাবে (বুদ্ধিজীবি ও) দায়িত্বশীল লোকেরা এ সকল ঘটনা ও বক্তব্যের খোঁজ–খবর নিচ্ছেন এবং এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, এদিক লক্ষ্য করে এটা (একেবারে ভিত্তিহীন ও রহস্যপ্রিয় লোকদের) কল্পিত বিষয় হওয়ার দিকটা একেবারে অসম্ভব মনে হচ্ছে। ডাঃ মোদী এ বিষয়েও ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন যে, তিনি যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, তারা ভিত্তিহীন গল্পকার তো নয়? তিনি দীর্ঘ আলোচনা–পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এত অধিক সংখ্যক লোক যারা বিভিন্ন এলাকার অধিবাসী, বিভিন্ন শ্রেণী (বয়স) ও পেশার সাথে সম্পৃক্ত, তাদের সকলের পক্ষে এক ও অভিন্ন (পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার) কথা বানিয়ে বলা সম্ভব নয় এবং এ সন্দেহ যুক্তিযুক্তও নয়।

কোন কোন ডাক্তার এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কোন কোন মাদক ও ওষুধ জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহারে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, মানুষ নিজে নিজেকে পরিবেশ ও প্রতিবেশ থেকে মুক্ত মনে করে। কোন কোন সময় তার মস্তিস্ক ভিত্তিহীন কল্পনাকে দৃশ্যাবলীর রূপ দিয়ে থাকে। এ অবস্থায় সে কিছু কল্পিত ও ভীত্তিহীন দৃশ্যাবলী দেখতে থাকে। হতে পারে এ সকল ব্যক্তি এ ধরনের কোন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু ডাঃ মোদী এ দুই অবস্থা ভিন্ন ভিন্নভাবে পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তিনি যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বাহ্যিকভাবে তাদের

পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা ঐ সকল কল্পনাপ্রসূত ভিত্তিহীন দৃশ্যাবলী থেকে ভিন্ন ছিল। ডাঃ মিলভিন মোর্স এ সম্ভাবনার উপর বৈজ্ঞানিকভাবে গবেষণার পর স্বীয় (অভিজ্ঞতার আলোকে) চূড়ান্ত ফলাফল এই প্রকাশ করেন যে, এ সকল পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা কল্পনাপ্রসূত ও অলীক (Hallucinations) নয়।

তিনি ঐ সকল লোকের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার দিকটি নিয়েও বিশদ আলোচনা করেছেন যে, হয়ত এ সকল লোকের মস্তিস্কে নিজেদের ধর্মীয় বিধি-বিধান (আকীদা-বিশ্বাস) এমনভাবে বসে গিয়েছিল যে, তারা বে-হুঁশ অবস্থায় বা স্বপ্নে ঐ সকল জিনিসকে বাস্তব ঘটনার মত প্রত্যক্ষ করেছে। ডাঃ মোদী এই ধারণাকেও অমূলক বলেছেন। কারণ, তিনি যাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক লোক এমনও ছিল, যারা কোন ধর্মই মানে না। অথবা তারা ধর্ম সম্পর্কে এত অজ্ঞ ও উদাসীন যে, ধর্মের এ ধরনের কোন প্রভাব তাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করার কোন অবকাশই নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, এ সকল পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা কি? এ থেকে কি সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়? এবং এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছ থেকে কি জানা যায়? এ ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ আগামী সপ্তাহে কিছু আলোচনা করব।

দুনিয়ার ওপারে
পর্ব–৩

বিগত দু' সংখ্যায় আমি ঐ সকল লোকের বর্ণনার সারাংশ পেশ করেছি যারা মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে ফিরে এসেছে। তাদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার এ ছিল যে, তারা নিজদেরকে নিজ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেখেছে, একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গ অতিক্রম করেছে, একটি নূরানী মাখলুকের অস্তিত্ব অনুভব (প্রত্যক্ষ) করেছে। পরবর্তীতে সেই নূরানী মাখলুক তাদের সামনে তাদের বিগত জীবনের পূর্ণ বিবরণ (নকশা) পেশ করেছিল।

এ কথা স্পষ্ট যে এ সকল লোক মৃত্যুবরণ করেনি। কারণ, যদি তারা মৃত্যুবরণ করে থাকত তাহলে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসতে পারত না। স্বয়ং ডাঃ মোদিও (যিনি এ সকল লোকের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন) এ কথা বলেছেন যে, তারা মৃত্যু দেখেনি। অবশ্য মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে কিছু আশ্চর্য ও অভিনব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে। সুতরাং এ সকল অবস্থা বর্ণনা করার জন্য তারা যে পরিভাষা ব্যবহার করেছে, তা হচ্ছে, (Near-Death Experience) তথা 'মৃত্যুর দুয়ারের অভিজ্ঞতা') সংক্ষেপে যাকে N.D.E বলা হয়। এই পরিভাষাই পরবর্তী লেখকরা ব্যবহার করেছেন। কাজেই যদি এ সকল লোকের বর্ণনা সত্যি বলে মেনে নেওয়া হয় (ডাঃ মোদীর চূড়ান্ত মতও এটাই যে, এত অধিক সংখ্যক লোককে একই সাথে একই বক্তব্যে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা সহজ নয়) তাহলেও একথা বলা যায় না যে, তারা মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছে। অবশ্য এ কথা বলা যায় যে, তারা নিজকে হারানো অবস্থায় ঐ জগতের (মৃত্যু পরবর্তী জীবনের) কিছু ঝলক দেখেছে, যে জগতের সীমান্ত বা দরজা হলো মৃত্যু।

মেডিক্যাল সাইন্সের অক্ষমতা

মেডিক্যাল সাইন্স তথা চিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু শুধুমাত্র ঐ সকল বিষয়েই বিশ্বাস রাখে, যা দৃষ্টিগোচর হয় অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়, সেহেতু চিকিৎসাবিজ্ঞান এখন পর্যন্ত মানুষের শরীরে 'রূহ' নামক কোন জিনিস আবিস্কার করতে পারেনি। তাছাড়া রূহের হাকীকত (প্রকৃত অবস্থা) পর্যন্ত পৌঁছাও সম্ভব নয়। সম্ভবতঃ রূহের আসল অবস্থা মেডিক্যাল সাইন্স কোন কালেও উদঘাটন করতে পারবে না। কারণ, পবিত্র কুরআন রূহ সম্পর্কে মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছে—

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَ مَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً - سورة بنى اسرائيل ٨٥)

(অর্থাৎ, "রূহ আমার প্রতিপালকের হুকুম বিশেষ', আর (এ সম্পর্কে) তোমাদেরকে খুবই কম ইলম দেওয়া হয়েছে।")

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৮৫)

মৃত্যুর হাকীকত

তবে কুরআন ও হাদীছ থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, হায়াত (বা জীবন) রূহ ও দেহের মজবুত সম্পর্কের নাম। আর মউত বলা হয় রূহ ও দেহের এ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে। এ বিষয়ে এ কথাটি মনে রাখার মত যে, আমরা আমাদের দৈনন্দিন আলাপচারিতায় মউতের অর্থ বুঝানোর জন্য 'ওফাত' শব্দ ব্যবহার করে থাকি। এটা পবিত্র কুরআনের শব্দ "توفى" হতে নির্গত। কুরআনের পূর্বে আরবী ভাষায় এ শব্দটি মউতের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। আরবী ভাষায় মউতের অর্থ বুঝানোর জন্য প্রায় চব্বিশটি শব্দ ব্যবহৃত হত। কিন্তু 'ওফাত' বা"توفى" শব্দের (মউতের অর্থে) অস্তিত্বই ছিল না। পবিত্র কুরআনেই সর্বপ্রথম মউতের অর্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মউত বুঝানোর জন্য এই (নতুন) শব্দ ব্যবহারের কারণ হলো, জাহেলী যুগের আরব

সম্প্রদায় মউতের জন্য যে সকল শব্দ প্রণয়ন করেছিল তা তাদের ঐ ভ্রান্ত ধারণা ও আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, মউতের পর আর কোন জীবন নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক "توفى" শব্দ ব্যবহার করে সূক্ষ্মভাবে ওদের (কাফেরদের) ঐ আকীদা খণ্ডন করেছেন। "توفى" শব্দের অর্থ হলো, কোন জিনিস পরিপূর্ণরূপে উসূল করে নেওয়া। কাজেই মউতের জন্য ঐ শব্দ ব্যবহার করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় মানুষের রূহকে তার শরীর হতে পৃথক করে তাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এই হাকীকতটি সুস্পষ্ট ভাষায় পবিত্র কুরআনের সূরা 'যুমার'এ এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ
الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ - (سورة الزمر ٤٢)

অর্থাৎ 'আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।'

(সূরা আয্ যুমার, আয়াত ৪২)

অপরদিকে হযরত আদম (আঃ)এর জীবন দান প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে হযরত আদম (আঃ)এর ভিতরে 'রূহ ফুঁকে দেওয়া' (সঞ্চার করা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

জীবন ও মৃত্যু

পবিত্র কুরআনের এ সকল বর্ণনা থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, দেহ ও শরীরের সাথে রূহের মজবুত সম্পর্ককেই জীবন বলে। দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক যত বেশী মজবুত হবে, জীবনের লক্ষণ তত

বেশী স্পষ্ট ও প্রদীপ্ত হবে। আর এ সম্পর্ক যত বেশী দুর্বল হতে থাকবে, জীবনের লক্ষণ ততবেশী নিষ্প্রভ হতে থাকবে। জাগ্রত অবস্থায় দেহ ও রূহের এ সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত থাকে, যার দরুন এ সময় জীবন স্পন্দন তার সকল লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যসহ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। জাগ্রত অবস্থায় মানুষের সকল ইন্দ্রিয় কাজ করতে থাকে। সকল অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত থাকে। এ সময় মানুষ তার কার্যক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং তার চিন্তা–চেতনায় কোন বাধা থাকে না। কিন্তু ঘুমের সময় দেহ ও রূহের এ সম্পর্ক কিছুটা দুর্বল হয়ে যায়, যার দরুন ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের মধ্যে জীবনের সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে বে–খবর থাকে এবং স্বেচ্ছায় স্বীয় অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে পারে না। সে সময় সে যথাযথভাবে চিন্তা–ভাবনা করার মত অবস্থায়ও থাকে না। তথাপি ঘুমন্ত অবস্থায়ও মানুষের দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক এই পরিমাণ মজবুত থাকে যে, তার শরীরে কোন কিছু ঘটলে সে তা অনুভব করতে পারে। কাজেই ঘুমের মধ্যেও যদি তার শরীরে কেউ সুঁই ঢুকিয়ে দেয়, তাহলে সে তার ব্যথা অনুভব করে জাগ্রত হয়ে যায়।

ঘুমের চেয়ে আরো দুর্বল অবস্থা হলো সংজ্ঞাহীন (বেহুঁশ) অবস্থা। এই অচেতন অবস্থায় দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক ঘুমন্ত অবস্থার চেয়েও দুর্বল হয়ে যায়। এ কারণেই পরিপূর্ণ অচেতন অবস্থায় যদি মানুষের দেহে অস্ত্রোপাচারও করা হয় তবুও সে ব্যথা অনুভব করে না। এ অচেতন অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে (প্রয়োজনে) বড় বড় অপারেশনও করা হয়। বেহুঁশ অবস্থায় মানুষের দেহ থেকে জীবনের অধিকাংশ লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য গায়েব হয়ে যায়। অবশ্য হৃদস্পন্দন ও শ্বাস–প্রশ্বাস চলতে থাকে। এতে তার জীবন্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বেহুঁশ অবস্থার চেয়েও আরো দুর্বল একটি অবস্থা মারাত্মক অসুস্থতার সময় কোন কোন লোকের ক্ষেত্রে দেখা যায়; যাকে সাধারণ আরবীতে

سكتة (তথা অসাড়—বাহ্যজ্ঞানহীন) অবস্থা বলা হয়। এ অবস্থায় মানুষের জীবনের বাহ্যিক সকল লক্ষণ লোপ পায়, এ সময় সাধারণ মানুষ এমনকি বিজ্ঞ ডাক্তার পর্যন্তও ঐ ব্যক্তির দেহে জীবনের সামান্য লক্ষণও দেখতে পায় না। হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ থাকে, রক্তচাপ (ব্লাডপ্রেসার) গায়েব হয়ে যায়, এমনকি শরীরের উষ্ণতাও প্রায় শেষ হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও মস্তিস্কের কোন এক গোপন কোষে জীবন স্পন্দন বাকি থাকে। এটাই সেই মুমূর্ষু অবস্থা, যে অবস্থায় ডাক্তাররা শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দন বহাল রাখার জন্য কিছু কৃত্রিম পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। কোন কোন লোকের ক্ষেত্রে এ সকল পদ্ধতি ফলদায়ক হয়। ফলে সেই মুমূর্ষু ব্যক্তিও সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। তার সুস্থ হওয়ার পরই এ কথা বুঝা যায় যে, সে তখন মৃত্যুবরণ করেনি এবং তার রূহও শরীর থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়নি। এ অবস্থাটা জীবনের সর্বাধিক দুর্বলতম অবস্থা। এ সময় মানুষের রূহের সম্পর্ক দেহের সাথে খুবই দুর্বল থাকে। আর রূহের সম্পর্ক দেহের সাথে যত বেশী দুর্বল হয়, রূহ দেহের বন্ধন থেকে তত বেশী স্বাধীন হয়। সুতরাং ঘুমন্ত অবস্থায় এই স্বাধীনতা কম হয়, তুলনামূলকভাবে বেহুঁশ অবস্থায় এর চেয়ে বেশী হয় এবং سكتة তথা অসাড় ও বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় আরো বেশী স্বাধীন হয়। কাজেই سكتة তথা অসাড় ও বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় যখন রূহের সম্পর্ক দেহের সাথে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন রূহ দেহের বন্ধন থেকে অনেকাংশে মুক্ত হয়ে যায়। সে সময় যদি কোন ব্যক্তির বোধশক্তি তার রূহের সফরে শরীক হয় এবং সে জাগতিক জীবনের ওপারে অবস্থিত অপর জগতের কিছু ঝলক দেখে নেয় তাহলে এটা অযৌক্তিক কিছু নয়। ইতিহাসেও এ ধরনের ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ অবস্থায় এ ধরনের লোকেরা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু দৃশ্য অবলোকন করে থাকে। ইতিপূর্বে আমি ডঃ মোদীর উদ্ধৃতি দিয়ে যে সকল লোকের বক্তব্য পেশ করেছি, যদি তাদের সম্পর্কে এ কথা মেনে নেওয়া হয় যে, তাদের বক্তব্য মিথ্যা ও প্রতারণামূলক নয়,

তাহলে তাদের এ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এ ধরনের বিষয়ই হবে। তবে তাদের সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে।

১. যে সকল লোক এসব দৃশ্য দেখেছে, তারা এখনো মৃত্যুবরণ করেনি, সুতরাং তারা যা কিছু দেখেছে, সেগুলোকে পরজগতের ঝলক বলা যেতে পারে। তবে মৃত্যুর পর যেসব ঘটনা ঘটবে এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. যে অবস্থায় তারা এসব দৃশ্য দেখেছে, সেটা ইহজীবনেরই একটি বিশেষ অবস্থা। অন্ততপক্ষে তখনো তাদের মস্তিষ্কের কোন গোপন কোষে জীবনস্পন্দন অবশিষ্ট ছিল বিধায় এ সকল দৃশ্য অবলোকনের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের কলা–কৌশল কার্যকরী হওয়াটা অযৌক্তিক নয়।

৩. যারা এ সকল দৃশ্যাবলীর বিবরণ দিয়েছে এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে তারা সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, সেই পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। একথা বলা সত্ত্বেও তারা তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার জন্য এই সীমিত শব্দাবলীর আশ্রয়ই নিয়েছে। কাজেই এখনো এ বিষয়টি সন্দেহযুক্ত যে, তারা সে অবস্থা এই সীমিত শব্দাবলীতে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কতটুকু সফল হয়েছে এবং সে সময়ের কোন কথা তাদের যথাযথভাবে কতটুকু স্মরণ আছে। তাছাড়া তাদের দেখা দৃশ্যাবলীর সর্বাংশের উপর আস্থা রাখাও সম্ভব নয় এবং এ সকল বিষয়কে মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনাবলীর আকীদার জন্য ভিত্তি বানানো যাবে না। মৃত্যুর পরের যে সকল হাকীকত জানা আমাদের জন্য আবশ্যক, তার সবকিছুই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর সন্দেহাতীত নির্ভুল পথে (লাভ করে) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। এগুলো সত্য বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য এ ধরনের বর্ণনার মুখাপেক্ষী নয়। তবে ঐ সকল লোকের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনার কিছু কিছু অংশের সমর্থন কুরআন ও হাদীছের বর্ণনার দ্বারা অবশ্যই হয়ে থাকে। যেমন, তাদের সকলের

বর্ণনাকৃত এ অংশটুকু কুরআন ও হাদীছ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, মানুষের জীবন শুধু এই দুনিয়ার জীবনেই সীমিত নয় বরং দুনিয়ার ওপারে আরো একটি জগত আছে। আমরা আমাদের বৈষয়িক ও স্থূল জীবনের খাঁচায় আবদ্ধ থেকে সে জগতের অবস্থাসমূহ যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারব না। সে জগতে যে সকল ঘটনা ঘটবে, তা আমাদের ইহকালের জীবনে ব্যবহৃত স্থান, কাল ও পাত্রের প্রচলিত নিয়মাবলীর অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। আমরা আমাদের দুনিয়ার জীবনে এটা কল্পনাও করতে পারি না, যে কাজের জন্য বছরের পর বছরের প্রয়োজন হয়, সে কাজ মুহূর্তের মধ্যে কিভাবে সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু পরকালে যে সব ঘটনা ঘটবে, তা সময়ের বন্ধনমুক্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন—

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ - (سورة الحج ٤٧)

অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার নিকট একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান। (সূরা হজ্জ, আয়াত ৪৭)

সেই জগৎ কেমন? তার চাহিদাই বা কি? সেই জগতে পৌছার জন্য কি ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন? এ সকল বিষয় জানানোর জন্যই যুগে যুগে নবী–রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) দুনিয়াতে এসেছেন। কারণ, সে জগতের বিষয়াবলী আমরা শুধুমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দিয়ে জানতে পারি না। সর্বশেষ যুগে আমাদেরকে এ সকল বিষয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘ইসলামী শরী‘অত’–এর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুতি নিতে চায়, সে যেন ‘ইসলামী শরী‘অত’ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। ফলে তার সামনে পারলৌকিক জগতের হাকীকত স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং সেখানে পৌছার সঠিক পথ ও পন্থা সে অর্জন করতে পারবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

পাকিস্তানের বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা ‘দৈনিক জঙ্গ’ ২৮ জানুয়ারী ১৯৯৮ ইং সংখ্যায় ‘ভুলে যাওয়ার মত নয়’ শিরোনামে ডাক্তার সাইয়্যেদ আমজাদ আলী সাহেব নিজের একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কাহিনী লিখেছেন। তাঁর লিখিত কাহিনীর সারাংশ এই—

১৯৮৪ সনের মার্চের ২৩ তারিখে তিনি মারাত্মক হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তিনি বলেন যে, এক পর্যায়ে আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বৃন্ধ হয়ে যায়। আমি প্রায় বিশ মিনিট মৃত অবস্থায় কাটাই। এ সময় আমাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আমি মৃত্যুর পূর্বক্ষণে নূরের তৈরী এক ব্যক্তিকে আমার নিকট আসতে দেখি। তার শরীরকে স্পর্শ করার সাথে সাথেই আমার শরীরের জীবনশক্তি অত্যন্ত দ্রুত পায়ের দিক থেকে আরম্ভ করে মাথার দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। ফলে আমি সম্পূর্ণরূপে আলোর ন্যায় অতি হালকা বস্তুতে পরিণত হই। আমি ঐ নূরানী ব্যক্তির সংসর্গে প্রশান্ত ছিলাম। আমি হাসপাতালের সকল ওয়ার্ড বিশেষ করে অতি মুমূর্ষু রোগীদের ওয়ার্ড পর্যবেক্ষণ করে এক কোণে দাঁড়িয়ে গেলাম। এ সকল ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল। আমি ঐ নূরানী ব্যক্তির সঙ্গে আমার শরীরের কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম যে, আমার শরীরের সাথে কি আচরণ করা হচ্ছে। আমার ডান পাশে হঠাৎ সুড়ঙ্গের আকৃতিতে ক্ষণিকের মধ্যেই লাল রংয়ের আলোর বৃত্ত গড়ে উঠল। আমি প্রশান্ত চিত্তে সুড়ঙ্গের ঐ আলোকবর্তিকা থেকে আনন্দ উপভোগ করতে লাগলাম। আমার মনে হলো, আমি যেন ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। আমার শরীরের উপর যে সকল ডাক্তারী পরীক্ষা–নিরীক্ষা হচ্ছে তার সাথে আমার যেন কোন সম্পর্ক নেই। হাসপাতালের বিভিন্ন অংশ থেকে শক্তির তরঙ্গ উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। আমাকে বলা হলো, এগুলো লোকদের দু'আ। কিন্তু যখন আমি আধ্যাত্মিকভাবে এ সংবাদ পেলাম যে, আমাকে ফিরে

যেতে হবে, তখন আমার ফিরে যাওয়ার এ সংবাদ ভাল মনে হলো না। অথচ এছাড়া আমার আর কোন উপায়ও ছিল না। অতঃপর আমি বাতাসে উড়ে এসে আমার শূন্য শরীরে ঢুকে পড়লাম। এ সময় আমার মনে হলো আমি অতীতেও এই (দেহের) ভার বহন করে চলেছি এবং ভবিষ্যতেও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এটা টেনে চলতে হবে। এরপর যখন আমার চোখ খুলল তখন আমি দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তিত হয়েছি।

এখন আমার প্রশ্ন হলো—

১. কোন ব্যক্তি কি বিশ মিনিট মৃত্যু অবস্থায় থেকে পুনরায় জীবিত হতে পারে?

২. মৃত ব্যক্তি কি কোন নূরানী মানুষের সাথে ভ্রমণ করতে পারে?

৩. মৃত ব্যক্তির রূহ কি অপর জগতে (পরকালে) যা কিছু হচ্ছে, তা দেখতে পারে?

আশা করি কুরআন ও হাদীছের আলোকে এর যথাযথ উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক

হাফেজ নূর মুহাম্মাদ

পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান--দারুল উলূম করাচীর ফতোয়া বিভাগ থেকে প্রদত্ত উত্তর ঃ

উত্তর ঃ

حامدا و مصليا -

ডাক্তার সাইয়েদ আমজাদ আলী সাহেব যে সকল দৃশ্য ও ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন, তা মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলী নয়। কারণ, তিনি যদি মৃত্যুই বরণ করে থাকতেন, তাহলে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে

আসতেন না। অবশ্য একথা বলা যেতে পারে যে, তিনি سكته (তথা অসাড়—বাহ্যজ্ঞানহীন) অবস্থায় মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে অপর জগতের (পরকালের) কিছু ঝলক দেখেছেন।

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনেকটা এরূপ ঃ জীবন বলা হয় দেহের সাথে রূহের গভীর ও মজবুত সম্পর্ককে। কাজেই দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক যত বেশী মজবুত হবে জীবনের লক্ষণও তত বেশী সুস্পষ্ট ও দীপ্ত হবে। আর এ সম্পর্ক যত বেশী দুর্বল হবে জীবনের লক্ষণ ততবেশী নিষ্প্রভ হতে থাকবে।

জাগ্রত অবস্থায় যেহেতু দেহ ও রূহের এ সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত থাকে, সেহেতু এ সময় জীবনের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। জাগ্রত অবস্থায় মানুষের সকল ইন্দ্রিয় কাজ করতে থাকে। দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত থাকে। মানুষ এ সময় তার স্বাধীন কর্মক্ষমতাকে পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে থাকে। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধি-বিবেচনায় কোন বাধা থাকে না। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় এ সম্পর্ক কিছুটা দুর্বল হয়ে যায়, ফলে নিদ্রাবস্থায় জীবনের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এ সময় মানুষ তার আশে-পাশের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর হয়ে যায়। আর মানুষ এ সময় স্বেচ্ছায় স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে পারে না। তাছাড়া ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনা করার পজিশনেও থাকে না। তা সত্ত্বেও ঘুমন্ত অবস্থায় দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক এতটুকু মজবুত অবশ্যই থাকে যে, তার শরীরের উপর ঘটে যাওয়া অবস্থাসমূহ অনুভব করার ক্ষমতা তার থাকে। সুতরাং ঘুমন্ত অবস্থায় যদি কেউ তার শরীরে সুঁই বিদ্ধ করে তাহলে সে তার ব্যথা অনুভব করে জাগ্রত হয়ে যায়।

বেহুঁশ-সংজ্ঞাহীন অবস্থা ঘুমের চেয়ে আরো দুর্বল অবস্থা। বেহুঁশ অবস্থায় দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক ঘুমন্ত অবস্থার চেয়েও আরো দুর্বল হয়ে যায়। এ কারণেই সম্পূর্ণ বেহুঁশ অবস্থায় যদি মানুষের শরীরে

অস্ত্রোপচার করা হয় তাহলে সে তার ব্যথা অনুভব করে না। বেহুঁশীর এ অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে এ সময় বড় বড় অপারেশন করা হয়। বেহুঁশ অবস্থায় মানুষের শরীর থেকে জীবনের অধিকাংশ লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য গায়েব হয়ে যায়। অবশ্য হৃদস্পন্দন ও শ্বাস–প্রশ্বাস অবশিষ্ট থাকে। ফলে তার জীবন্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বেহুঁশ অবস্থার চেয়েও আরো একটি দুর্বলতম অবস্থা মারাত্মক অসুস্থতার দরুন কোন কোন লোকের মধ্যে ঘটে থাকে, যাকে প্রচলিত আরবী ভাষায় سكتة (তথা অসাড়—বাহ্যজ্ঞানহীন) অবস্থা বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে জীবনের সকল বাহ্যিক লক্ষণাদি শেষ হয়ে যায়। এ সময় কেবলমাত্র সাধারণ মানুষই নয়, ডাক্তারদের চোখেও বাহ্যিকভাবে জীবনের কোন স্পন্দন দৃষ্টিগোচর হয় না, হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। শ্বাস–প্রশ্বাস থেমে যায়। রক্তচাপ গায়েব হয়ে যায়। শরীরের উষ্ণতাও প্রায় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মস্তিস্কের কোন গোপন কোষে জীবন স্পন্দন অবশিষ্ট থাকে। এটাই সেই মুমূর্ষু অবস্থা, যখন ডাক্তাররা সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে শ্বাস–প্রশ্বাস বা হৃদস্পন্দন বহাল করার জন্য কিছু কিছু কৃত্রিম উপায় প্রয়োগ করে থাকেন। কোন কোন রোগী এই ব্যবস্থা প্রয়োগের পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার ফলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে তখন মৃত্যুবরণ করেনি এবং তার রূহ দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে যায়নি। এটাই জীবনের সবচেয়ে দুর্বলতম অবস্থা। এ অবস্থায় মানুষের রূহের সম্পর্ক দেহের সাথে খুবই সামান্য অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর রূহের সম্পর্ক দেহের সাথে যতই দুর্বল হতে থাকে, রূহ দেহের বন্ধন থেকে ততই মুক্ত হতে থাকে। ঘুমন্ত অবস্থায় এই আযাদী কম হয়। পক্ষান্তরে বেহুঁশ অবস্থায় এর চেয়ে বেশী এবং سكتة (তথা অসাড়—বাহ্যজ্ঞানহীন) অবস্থায় এর চেয়েও বেশী দুর্বল হয়ে যায়। কাজেই سكتة র এ অবস্থায় যখন রূহের সম্পর্ক দেহের সাথে সামান্যই অবশিষ্ট থাকে এবং রূহ দেহের বন্ধন থেকে অনেকাংশে মুক্ত হয়ে যায়

তখন যদি কোন মানুষের বোধশক্তি স্বীয় রূহের সাথে সফরে শরীক হয় এবং এই জাগতিক জীবনের ওপারে অপর জগতের (তথা আখেরাতের) কোন ঝলক অবলোকন করে নেয়, তাহলে এটা অসম্ভব কিছু নয়। ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ অবস্থায় এ ধরনের লোকেরা ঊর্ধ্বজগতের কতিপয় দৃশ্য অবলোকন করেছে। তবে এ ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে—

১. উল্লেখিত ব্যক্তি এবং অন্যান্য যারা এ সকল দৃশ্য দেখেছে, তারা কেউই তখনো মৃত্যুবরণ করেনি। কাজেই তাঁরা যা কিছু দেখেছে তা অপর জগতের ঝলক তো হতে পারে, কিন্তু মৃত্যু পরবর্তী জীবনে অনুষ্ঠেয় ঘটনাবলী নয়।

২. যে অবস্থায় তারা এ সকল দৃশ্য দেখেছে, সেটা ইহজীবনের একটি অবস্থা। কারণ, মস্তিষ্কের গোপন কোষে তখনও জীবন স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। সুতরাং ঐ দৃশ্যাবলী মস্তিষ্কপ্রসূত হওয়াটাও বিচিত্র নয়।

(উত্তরের এ অংশ 'দুনিয়ার ওপারে' নামক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।)

উত্তর সঠিক হয়েছে
মাহমূদ আশরাফ উছমানী
মুফতী ঃ দারুল উলূম করাচী
তারিখ ঃ ২৪/৫/১৪১৯ হিঃ

উত্তরদাতা—
মুহাম্মাদ ইয়াকুব
দারুল ইফতা (ফতোয়া বিভাগ)
দারুল উলূম করাচী
তারিখ ঃ ২৪/৫/১৪১৯ হিঃ

মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি

১৯৯৬ইং সনের ৩১শে মে করাচীর বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উছমানী ছাহেব নিম্নোক্ত বয়ানটি পেশ করেন।

মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهد ان لا اله الا الله و حده لا شريك له و نشهد ان سيدنا و سندنا و مولانا محمدا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على اله واصحابه و بارك و سلم تسليما كثيرا كثيرا - اما بعد فقد قال النبى صلى الله عليه و سلم : اكثروا ذكر هاذم اللذات يعنى الموت - ترمذى شريف ٢ : ٥٧

و قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا و تزينوا للعرض الاكبر وانما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه فى الدنيا - ترمذى شريف ٢ : ٧٢

দুটি হাদীছ আপনাদের সামনে পেশ করা হয়েছে, যার শাব্দিক তরজমা নিম্নরূপ—

প্রথম হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ অধিক পরিমাণে সকল জিনিসের স্বাদ বিনাশকারীকে অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ কর। (তিরমিযী ২/৫৭ পৃঃ)

অপর হাদীছে হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ তোমাদের হিসাব নেওয়ার পূর্বে নিজেরাই নিজদের হিসাব নাও। বড় হিসাবের জন্য প্রস্তুত হও। কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির হিসাব সহজ হবে, যে দুনিয়াতে নিজের হিসাব নিয়েছে। (তিরমিযী ২/৭২ পৃঃ)

মৃত্যু একটি অপরিহার্য বিষয়

মউত অবশ্যই আসবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। মৃত্যু অনিবার্য হওয়ার ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি। মউতের আগমনের কথাও কেউ অস্বীকার করেনি। নাস্তিকেরা (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহকে অস্বীকার করে বলেছে, আমরা আল্লাহকে মানি না। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু তারাও মউতকে অস্বীকার করতে পারেনি। প্রতিটি লোক একথা স্বীকার করে যে, যারাই এ দুনিয়ায় আগমন করেছে তাদের সকলকেই একদিন না একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে। এ ব্যাপারেও দুনিয়ার সকল মানুষ একমত যে, মউতের জন্য কোন বয়স নির্দিষ্ট নেই। হতে পারে—এখনই মৃত্যু সংঘটিত হবে, অথবা এক মিনিট পরে সংঘটিত হবে, এখন থেকে এক ঘন্টা পরেও মউত আসতে পারে, একদিন পরেও মৃত্যু হতে পারে, এক মাস কিংবা এক বছর পরেও মউত আসতে পারে। এ ব্যাপারে কিছুই জানা নেই। বর্তমানে বিজ্ঞানের গবেষণা উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজ্ঞান একথা উদঘাটন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম যে, কে কখন মারা যাবে।

মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের অর্থ

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, মউত অবশ্যই আসবে। এবং এ কথাও অনিবার্য যে, মউতের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই। সুতরাং কোন মানুষ যদি গাফেল–অসতর্ক অবস্থায় দুনিয়া থেকে চলে

যায় তাহলে সেখানে (কবরে) পৌছে তার কি অবস্থা হবে তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। এমন যেন না হয় যে, কবরে পৌছে আল্লাহ পাকের ক্রোধ ও আযাবের সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, প্রকৃত মউত আসার পূর্বেই তোমরা মউতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কিভাবে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করবে? হিসাব নেওয়ার পূর্বে নিজে নিজের হিসাব নেওয়ার কি অর্থ? উলামায়ে কেরাম এ কথার দু'টি অর্থ করেছেন। একটি অর্থ এই যে, প্রকৃত মউত আসার পূর্বে তুমি স্বীয় প্রবৃত্তির ঐ সকল চাহিদা (খাহেশাতে নফস) যা আল্লাহ পাকের হুকুমের পরিপন্থী, সেগুলোকে এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা ও পাপের যে আগ্রহ তোমাদের অন্তরে জাগ্রত হয়, সেগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সমূলে বিনাশ করে দাও।

আমাকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে

উলামায়ে কেরাম মউত আসার পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করার অপর একটি অর্থ এই করেছেন যে, মউতের পূর্বে নিজের মৃত্যুর ধ্যান করো। অর্থাৎ মাঝে মাঝে এই চিন্তা করবে যে, একদিন না একদিন আমাকে এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় টাকা-কড়ি, সন্তান-সন্ততি কিছুই আমার সঙ্গে যাবে না, আমাকে শূন্য হাতে যেতে হবে। বাংলো-প্রাসাদ, বন্ধু-বান্ধব কিছুই সাথে যাবে না। সবকিছু ছেড়ে খালি হাতে একাই যেতে হবে। এ বিষয়টি একটু গভীরভাবে চিন্তা কর।

আসলে আমাদের দ্বারা এ দুনিয়াতে যত অন্যায়-অত্যাচার অপরাধ ও গোনাহ হয়ে থাকে তার সবচেয়ে বড় কারণ এটাই যে, মানুষ তার মৃত্যুকে ভুলে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের শরীর সুস্থ ও সবল থাকে এবং হাত-পা সচল থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ভাবতে থাকে—

هم چوں ما دیگرے نیست

অর্থাৎ আমাদের চেয়ে বড় আর কেউ নেই।

জমিন ও আসমানকে সে এক করে ফেলে। সে সময় মানুষ অহংকারে লিপ্ত হয়, নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করে। অন্যের উপর অত্যাচারও করে থাকে। অন্যের অধিকার (হক) খর্ব করে। সুস্থ ও যুবক অবস্থায় এ সকল অপকর্ম করতে থাকে। কখনো এ খেয়াল হয় না যে, একদিন আমাকেও এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। নিজের হাতে নিজের প্রিয়জনকে মাটি দিয়ে আসে, নিজের কাঁধে নিজের প্রিয়জনের লাশ বহন করে। তা সত্ত্বেও একথা চিন্তা করে যে, মৃত্যু তো তার হয়েছে এ ঘটনা তো আমার সাথে ঘটেনি। এভাবে গাফেল অবস্থায় জীবন যাপন করে সে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করে না।

দুটি বড় নেআমত সম্পর্কে গাফলতী

এক হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সুন্দর কথা বলেছেন—

نعمتان مغبون كثير من الناس الصحة والفراغ - بخارى حديث ٦٤٩

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দুটি নেআমত এমন রয়েছে, যা সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই ধোঁকায় পড়ে আছে, একটি নেআমত হলো সুস্থতা—অপরটি হলো অবকাশ।

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সুস্থতার নেআমত ভোগ করতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই ভুল ধারণায় পড়ে থাকে যে, সুস্থতার এই নেআমত সর্বদাই অব্যাহত থাকবে। সুস্থ অবস্থায় সৎ ও নেক কাজে টালবাহানা করতে থাকে যে, আজকের এই নেক কাজ আগামী দিন করব। আগামী দিন না হলে পরশু করবো। কিন্তু পরবর্তীতে এমন একটি সময় আসে যখন সুস্থতার এ সময় পেরিয়ে যায়। অপর নেআমত হলো অবকাশ।

অর্থাৎ সৎ ও নেক কাজ করার অবকাশ ও সময় পেয়েও মানুষ সৎ ও নেক কাজকে এ কথা চিন্তা করে ফেলে রাখে যে, এখনো সময় যথেষ্ট আছে। এ কাজ পরে করে নিবো। এখন তো মাত্র যৌবন কাল। মানুষ যৌবন কালে পাহাড়কেও হটিয়ে দিতে পারে। কঠিন থেকে কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে পারে। আর যদি ইচ্ছা করে, তাহলে যৌবনে অনেক ইবাদতও করতে পারে। অনেক পরিশ্রম ও সাধনাও করতে পারে। মানুষের সেবা করতে পারে। আল্লাহ্ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য নেকীর ভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু মন-মস্তিষ্কে এ কথা চেপে বসে থাকে যে, আমিতো এখনো যুবক। এখন একটু জীবনের স্বাদ উপভোগ করে নিই। ইবাদাত-বন্দেগী করার এবং নেক কাজ করার জীবনে এখনো ঢের সময় আছে, এ সকল কাজ পরে করব। এভাবে সে নেক কাজকে টালতে থাকে। এমনকি এভাবে একদিন তার অজান্তেই যৌবনে ধস নেমে আসে, শরীর খারাপ হয়ে যায়। দুর্বলতা চেপে বসে। ফলশ্রুতিতে যৌবন চলে যাওয়ার পর ইবাদত-বন্দেগী ও নেক কাজ করার ইচ্ছে থাকলেও শক্তি-সামর্থ না থাকার কারণে পেরে উঠে না। অথবা অবকাশ মিলে না। কারণ তখন ব্যস্ততা এত বেশী হয়ে যায় যে, ইবাদত-বন্দেগী করার মত ফুরসত মিলে না।

এ সকল বিষয় এজন্য সামনে আসে যে, মানুষ মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত উদাসীন থাকে। মৃত্যুর কথা খেয়ালই করে না। যদি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় মৃত্যুকে এভাবে স্মরণ করত যে, একদিন আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং মৃত্যুর পূর্বে আমাকে এ কাজ করতে হবে। এ ধরনের চিন্তা মানুষকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং সৎপথে পরিচালিত করে। এজন্যই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতে বলেছেন।

হযরত বাহলুল (রহঃ)এর নসীহতমূলক ঘটনা

খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনকালে হযরত বাহলুল (রহঃ) নামে আত্মহারা (মাযজুব) প্রকৃতির একজন বুযুর্গ ছিলেন। হারুনুর রশীদ এই বুযুর্গের সঙ্গে প্রায়ই হাস্য–কৌতুক করতেন। ইনি যদিও আত্মহারা প্রকৃতির ছিলেন কিন্তু কথাবার্তা অত্যন্ত গভীর জ্ঞানসম্পন্ন বলতেন। খলীফা হারুনুর রশীদ প্রহরীদের বলে রেখেছিলেন, এই বুযুর্গ যখন আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসবেন, তাকে আসতে দিবে, কোন প্রকার বাধা দিবে না। কাজেই যখনই তার ইচ্ছে হত নির্বিঘ্নে দরবারে চলে যেতেন। একদিন হযরত বাহলুল (রহঃ) যখন খলীফার দরবারে পৌছলেন তখন তাঁর হাতে একটি লাঠি দেখতে পেলেন। খলীফা হারুনুর রশীদ হযরত বাহলুল (রহঃ)কে কিছুটা হাস্যচ্ছলে বললেন ঃ বাহলুল সাহেব ! আপনার নিকট আমার একটি অনুরোধ। তিনি বললেন, কি সেই অনুরোধ? হারুনুর রশীদ বললেন, আমি এই লাঠি আমানতরূপে আপনাকে দিচ্ছি। আপনি যদি আপনার চেয়ে নির্বোধ কাউকে দুনিয়াতে খুঁজে পান, তাহলে এটা আমার পক্ষ থেকে তাকে হাদীয়া স্বরূপ দিয়ে দিবেন। হযরত বাহলুল (রহঃ) ঠিক আছে বলে সে লাঠি রেখে দিলেন। খলীফা হারুনুর রশীদ কৌতুক করে এ কথা বলতে চেয়েছিলেন যে, দুনিয়াতে আপনিই সবচেয়ে নির্বোধ। আপনার চেয়ে বোকা আর কেউ নেই। হযরত বাহলুল (রহঃ) সেই লাঠি নিয়ে চলে গেলেন।

এ ঘটনার কয়েক বছর পর হযরত বাহলুল (রহঃ) একদা জানতে পারলেন যে, খলীফা হারুনুর রশীদ মারাত্মক অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। অনেক চিকিৎসা করা হচ্ছে কিন্তু কোন উপকার হচ্ছে না। তাই তিনি বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন ! কেমন আছেন? হারুনুর রশীদ বললেন, আর কেমন আছি ! সামনে সফর করতে হবে ! হযরত বাহলুল (রহঃ) প্রশ্ন করলেন, কোথাকার সফর? বাদশাহ বললেন, আখেরাতের সফর। দুনিয়া থেকে

বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে। হযরত বাহলুল (রহঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কতদিন পর ফিরে আসবেন? হারুনুর রশীদ বললেন, ভাই এটা আখেরাতের সফর। এ সফর থেকে কেউ ফিরে আসে না। হযরত বাহলুল (রহঃ) বললেন, তাহলে আপনি আর ফিরে আসবেন না! আচ্ছা এ সফরের আরাম ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার জন্য কতজন সৈন্য–সামন্ত আগে প্রেরণ করেছেন? বাদশাহ বললেন ঃ ভাই, তুমি আবার নির্বোধের মতো কথা বলছ। আখেরাতের সফরে কেউ সাথে যায় না। কোন বডিগার্ড, কোন সৈন্য, কোন লোক–লশকর সাথে নেওয়া যায় না। ঐ সফরে তো মানুষকে একাই যেতে হয়। হযরত বাহলুল (রহঃ) বললেন, এত দীর্ঘ সফর, তারপর সেখান থেকে আর ফিরেও আসবেন না, তা সত্ত্বেও আপনি কোন সৈন্য–সামন্ত পূর্বে পাঠালেন না। অথচ এর আগে আপনি যত সফর করেছেন, সকল সফরেই আরামের ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা করার জন্য আপনার পূর্বে বিরাট সৈন্যবাহিনী ও আসবাবপত্র প্রেরণ করা হত। এ সফরে কেন সেগুলো পাঠাচ্ছেন না? বাদশাহ বললেন, না ভাই, এ সফরই এমন যে, এ সফরে সৈন্য–সামন্ত ও লোক–লশকর প্রেরণ করা যায় না।

হযরত বাহলুল (রহঃ) বললেন, জনাব বাদশাহ! অনেক দিন থেকে আপনার একটি আমানত আমার নিকট পড়ে আছে। আর তাহলো একটি লাঠি। আপনি সেই লাঠিটি আমাকে একথা বলে দিয়েছিলেন যে, যদি দুনিয়াতে তোমার চেয়ে বোকা কাউকে পাও তাহলে এটা আমার পক্ষ থেকে তাকে হাদীয়া স্বরূপ দিয়ে দিও। আমি অনেক খুঁজেছি কিন্তু আমি আমার চেয়ে বোকা একমাত্র আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে পাইনি। আর এটা এজন্য যে, আমি দেখেছি আপনার ছোট থেকে ছোট সফর সামান্য সময়ের জন্য হলেও প্রায় মাসখানেক পূর্ব থেকে তার প্রস্তুতি চলত। পানাহারের জিনিসপত্র, তাঁবু, লোক–লশকর, বডিগার্ড সবকিছুই আপনার সফরের পূর্বে পাঠানো হত। আর এখন এত দীর্ঘ সফর এবং এমন সফর যেখান থেকে আর ফেরাও হবে না, তার কোন প্রস্তুতি নেই।

আপনার চেয়ে বোকা আমি দুনিয়াতে আর কাউকে দেখিনি। কাজেই আপনাকে আমি আপনার দেওয়া আমানত ফিরিয়ে দিচ্ছি।

এ কথা শুনে খলীফা হারুনুর রশীদ কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, বাহ্‌লুল, তুমি ঠিক বলেছ, সারাজীবন আমি তোমাকে বোকা মনে করেছি। কিন্তু আসল বুদ্ধিমানের মত কথা তুমিই বলেছ। আসলেই আমি আমার জীবন নষ্ট করেছি। কারণ, আখেরাতের এ সফরের কোন প্রস্তুতি নেইনি।

বুদ্ধিমান কে?

প্রকৃত পক্ষে হযরত বাহলুল (রহঃ) যে কথা বলেছেন, সেটা হাদীছেরই কথা। হাদীছ শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت – ترمذی باب ٣٦

[অর্থাৎ বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফ)]

এ হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, বুদ্ধিমান কে। আজকের দুনিয়ায় বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে খুব উপার্জন করতে পারে, ধনভাণ্ডার গড়ে তোলা ও পয়সা থেকে পয়সা বানানোতে যে বেশী পারদর্শী তাকেই বুদ্ধিমান মনে করা হয়। আর যে মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে তাকেও বুদ্ধিমান মনে করা হয়। কিন্তু এই হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে বুদ্ধিমান বলেছেন, যে নিজের নফসকে (প্রবৃত্তিকে) নিয়ন্ত্রণে রাখে, প্রবৃত্তির সকল চাহিদা পূরণ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে না। বরং সে নিজের নফসকে আল্লাহ পাকের হুকুমের অধীন রাখে। আর মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এমন ব্যক্তিই বুদ্ধিমান। যদি এ কাজ না করে তাহলে

তাকে বোকা বলা হবে। কারণ, সে তার সমগ্র জীবন অহেতুক কাজে ব্যয় করল। যেখানে সর্বদা থাকতে হবে, সেখানের জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করল না।

আমরা সবাই নির্বোধ

খলীফা হারুনুর রশীদকে সম্বোধন করে হযরত বাহলুল (রহঃ) যে কথা বলেছিলেন, গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে তা আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় আমাদের প্রত্যেককে সর্বদা এই চিন্তা আচ্ছন্ন করে রাখে যে, বাড়ী কোথায় বানাব, কিরূপে বানাব, সেখানে আরাম–আয়েশের কি কি উপায়–উপকরণ থাকবে! আর দুনিয়ার জীবনে যদি কোথাও সফরে যেতে হয়, তাহলে বেশ কিছুদিন পূর্বেই সিট বুকিং দেওয়া হয় যাতে সময় মত সিট পেতে কোন অসুবিধা না হয়। যেখানে যাওয়া হবে কয়েকদিন পূর্বেই সেখানে সংবাদ দেওয়া হয়। হোটেলে সিট বুক করানো হয়। এ সকল কাজ সফরের পূর্বেই সম্পন্ন করা হয়। অথচ দুনিয়ার এ সফর খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে সদা–সর্বদা থাকতে হবে, যে জীবনের কোন শেষ নেই, সে জগতের জন্য কোন চিন্তা নেই যে, সেখানের বাড়ী কিভাবে নির্মাণ করবো। সে জগতের জন্য সিট বুক কিভাবে করবো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন যে, বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যদি মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করে, তাহলে সে নিতান্তই বোকা। চাই সে যত বড় ধনী ও সম্পদশালীই হোক না কেন। আখেরাতের জন্য প্রস্তুতির পথ এই যে, মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কথা অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে এবং তার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

মৃত্যু ও আখেরাতের চিন্তা করার পদ্ধতি

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, প্রতিদিনের একটি নির্ধারিত সময়ে নির্জনে একাকী বসে একথা চিন্তা করবে যে, আমার শেষ সময় উপস্থিত। ফেরেশতা আমার জান কবয করার জন্য পৌঁছে গেছে এবং সে আমার জান কবয করে নিয়েছে। আমার আত্মীয়-স্বজন আমার গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করছে। শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে খাটে করে কবরস্থানে নিয়ে গেল। জানাযার নামায পড়ে আমাকে কবরে রেখে দিল। অতঃপর কবরকে মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিল। আমার উপরে কয়েক মণ মাটি দিয়ে সেটাকে সযত্নে নিখুঁতভাবে বন্ধ করে দিয়ে সকলেই চলে গেল। এখন অন্ধকার কবরে আমি একা অবস্থান করছি। ইতিমধ্যে প্রশ্নোত্তরের জন্য ফেরেশতারা কবরে আগমন করলেন। তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন।

অতঃপর আখেরাতের চিন্তা এভাবে করবে যে, আমাকে কবর থেকে পুনরায় উঠানো হলো। এখন হাশরের ময়দান কায়েম হচ্ছে। সকল মানুষ হাশরের ময়দানে একত্রিত হয়েছে। সেখানে মারাত্মক গরম। সকলের শরীর হতে ঘাম ঝরছে। সূর্য একেবারে নিকটে। সকলে মারাত্মক চিন্তিত। মানুষেরা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের খেদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করছেন যে, আল্লাহ্ পাকের নিকট দরখাস্ত করুন যাতে হিসাব-কিতাব শুরু করা হয়। অতঃপর এভাবে হিসাব-কিতাব, পুলসিরাত, বেহেশত ও দোযখের কথা চিন্তা করবে। প্রতিদিন ফজর নামায আদায়ের পর কুরআন শরীফ তেলাওয়াত, মুনাজাতে মাকবুল পাঠ ও অন্যান্য যিকির-আযকার থেকে ফারেগ হয়ে একটু চিন্তা করবে যে, এ ঘটনাগুলো আমার জীবনে ঘটবে, এ (মৃত্যুর) সময় আমার জীবনে অবশ্যই আসবে। আর এটা আমার জানা নেই যে, এ সময় কখন এসে যাবে। এটাও আমার জানা নেই যে, আজই এসে যায় কিনা। এই

চিন্তা (মুরাকাবাহ) করার পর আল্লাহ পাকের নিকট এই বলে দুআ করবে যে, ইয়া আল্লাহ! আমি দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজ-কারবারের জন্য বের হচ্ছি, এমন কাজ যেন আমার দ্বারা না হয়, যা আমার জন্য আখেরাতে ধ্বংসের কারণ হয়। প্রতিদিন এভাবে চিন্তা (মুরাকাবাহ) করবে। একবার যখন অন্তরে মৃত্যুর চিন্তা ও আখেরাতের ধ্যান বসে যাবে, তখন ইনশাআল্লাহ আত্মশুদ্ধির ফিকির হবে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু নু'আম (রহঃ)এর কাহিনী

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু নু'আম (রহঃ) নামে একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সময়ে এক ব্যক্তির অন্তরে একথা জাগ্রত হলো যে, আমি বিভিন্ন মুহাদ্দিছ, ফকীহ, উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে প্রশ্ন করব যে, আপনি যদি কোনভাবে জানতে পারেন যে, আপনার জীবনের মাত্র একটি দিন বাকী আছে, আগামী কালই আপনার মৃত্যু হবে, তাহলে আপনি এই একটি দিন কিভাবে অতিবাহিত করবেন? এবং এই একটি দিন কি কাজে ব্যয় করবেন? প্রশ্নের কারণ এই ছিল যে, এ সকল বড় বড় মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও বুযুর্গানে দ্বীন এর উত্তরে হয়ত উত্তম আমলের কথা বলবেন এবং সর্বোত্তম কাজে এ দিনটি অতিবাহিত করবেন। আর এভাবে আমি সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে অবগত হতে পারব এবং আমি ভবিষ্যৎ জীবনে সে সকল উত্তম আমল করব। এ লক্ষ্য নিয়ে ঐ ব্যক্তি এ প্রশ্ন অনেক বুযুর্গের নিকট করেছেন। এ প্রশ্নের উত্তরে একেক জন একেক কথা বলেছেন। কিন্তু প্রশ্নকর্তা যখন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু নু'আম (রহঃ)এর নিকট এসে এ প্রশ্ন করলেন তখন তিনি উত্তরে বললেন, আমি প্রতিদিন যে কাজ করি এদিনও সে কাজই করব। কারণ, আমি প্রথম দিন থেকেই আমার রুটিন ও কর্মসূচী একথা লক্ষ্য করে

সাজিয়েছি যে, এদিনই হয়ত আমার জীবনের শেষ দিন। হয়ত আজই আমার মৃত্যু হবে। আমার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচীতে এতটুকুও ফাঁক নেই যে, তাতে নতুন কোন আমল সংযোজন করব। যে কাজ প্রতিদিন করি, জীবনের শেষ দিনও সেই একই কাজ (আমল) করব। এটাই ঐ হাদীছের উদ্দেশ্য, যে হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

اكثروا ذكر هاذم اللذات يعنى الموت

[অর্থাৎ সকল স্বাদ বিনাশকারীকে (তথা মৃত্যুকে) অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।]

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু নু'আম (রহঃ) এই হাদীছের উপর আমল করার জন্য মৃত্যুর ধ্যান-খেয়াল ও চিন্তাকে এমনভাবে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন যে, সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন— মৃত্যু যখন আসতে চায় আসুক।

আল্লাহ পাকের সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ

আল্লাহ পাকের সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ সম্পর্কে হাদীছ শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

من احب لقاء الله احب الله لقائه – صحيح بخارى

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করে এবং আল্লাহ পাকের সঙ্গে সাক্ষাতের (প্রবল) আগ্রহ রাখে, আল্লাহ পাকও তার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ রাখেন।

এ ধরনের লোকেরা সর্বদা মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকে এবং মনে মনে বলতে থাকে—

غدا نلقى الاحبه محمدا و حزبه –

অর্থাৎ আগামীকাল স্বীয় বন্ধু অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

এই মৃত্যু চিন্তার ফলেই মানুষের জীবন শরীঅত ও সুন্নাতের অনুসরণে অভ্যস্ত হয়ে গড়ে ওঠে। এতে করে মৃত্যুর জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে। মোটকথা, প্রতিদিন সামান্য কিছু সময় বের করে এভাবে মৃত্যুর চিন্তা করবে যে, একদিন নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু আসবে, আমি তার জন্য কি ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছি!

আজই নিজের হিসাব নাও

আমি অপর যে হাদীছটি দিয়ে আলোচনা শুরুতে পাঠ করেছিলাম, তার এক অংশ হলো—

حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا –

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমার হিসাব নেওয়ার পূর্বেই তুমি নিজে নিজের হিসাব নাও। কারণ, আখেরাতে তোমার প্রতিটি আমল ও প্রতিটি কাজের হিসাব নেওয়া হবে।

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ –

سورة الزلزال

অর্থাৎ 'তোমরা যে সকল সৎকর্ম করেছ সেগুলোও দেখতে পাবে আর যে সকল অপকর্ম করেছ সেগুলোও দেখতে পাবে।'

এ কথাটিকেই কোন এক কবি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন—

تم آج ہوا سمجھو جو روز جزا ہوگا

অর্থাৎ তুমি আজকের দিনকেই বিচারের দিন মনে করে নিজের হিসাব নাও।

কেয়ামতের দিন যে হিসাব নেওয়া হবে তুমি সেদিনের হিসাবের পূর্বেই নিজের হিসাব নিজে নিতে শুরু কর। অর্থাৎ প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর পূর্বে সারাদিনের কাজ-কর্ম ও কথাবার্তার হিসাব এভাবে নিবে যে, আজকে আমি সারাদিন যে সকল কাজ করলাম তা সম্পর্কে যদি কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক প্রশ্ন করেন তাহলে আমি তার কি উত্তর দিব। এভাবে প্রতিদিন কৃতকর্ম সম্পর্কে চিন্তা করবে।

সকালে নফসের (মনের) সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে

ইমাম গাযালী (রহঃ) আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও ফলদায়ক একটি পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। আমরা যদি তার বাতলানো তরীকার উপর আমল করতে পারি, তাহলে এটা আমাদের জন্য অব্যর্থ মহৌষধ প্রমাণিত হবে। এর চেয়ে উত্তম কোন ব্যবস্থাপত্র পাওয়া দুষ্কর। তিনি বলেন, প্রতিদিন তোমাকে কয়েকটি কাজ করতে হবে ঃ—

প্রথম কাজ—

১. নফসের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া

সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের নফস তথা মনের সাথে এভাবে চুক্তিবদ্ধ হবে যে, আজ আমি সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর হতে রাতে পুনরায় ঘুমানো পর্যন্ত কোন প্রকার গোনাহ করব না। আর আমার উপর শরীঅত কর্তৃক নির্ধারিত ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহ যথাযথভাবে আদায় করব। এছাড়া আমার দায়িত্বে আল্লাহ পাক ও তাঁর বান্দাদের যত হক আছে তাও পরিপূর্ণরূপে আদায় করব। যদি ভুলেও এ চুক্তির খেলাফ কোন কাজ আমার দ্বারা হয়, তাহলে এর জন্য হে নফস তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই চুক্তি একটি (মূল্যবান) কাজ। এটাকে পরিভাষায় مشارطه অর্থাৎ পরস্পরে শর্তারোপ করা বলে।

চুক্তির পর দু'আ করা

আমাদের শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী হযরত ডাঃ আবদুল হাই আরেফী (রহঃ) ইমাম গাযালী (রহঃ)এর উপরোক্ত প্রস্তাবের প্রথমাংশের সাথে আরেকটি বিষয় সংযোজন করেন। তিনি বলেন, নফসের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর আল্লাহ পাকের নিকট এই দুআ কর—হে আল্লাহ! আমি স্বীয় নফসের সাথে এই ওয়াদা করেছি যে, আজ কোন গোনাহ করব না এবং ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত সব আদায় করব। শরীঅতের বিধান মত চলব। আল্লাহর হক, বান্দার হক সব ঠিক মত আদায় করব। কিন্তু হে আমার আল্লাহ! আপনি যদি তাওফীক দান না করেন, তাহলে আমি ঐ চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারব না। কাজেই আমি যখন ঐ চুক্তি করে ফেলেছি, আপনি তা রক্ষা করুন। আমাকে ঐ চুক্তির উপর অটল ও অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। আমাকে চুক্তি ভঙ্গ করা থেকে বাঁচান এবং আমাকে এই চুক্তির উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন। চুক্তির পর এভাবে দু'আ করবে।

দ্বিতীয় কাজ—

২. সারাদিন আমলের মুরাকাবাহ

উপরোক্ত নিয়মে দু'আ করার পর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজে বের হবে। যদি চাকুরীজীবী হও, তাহলে চাকুরীতে বেরিয়ে পড়। যদি ব্যবসায়ী হও, তাহলে ব্যবসার কাজে বেরিয়ে পড়। যদি দোকানে বসার দায়িত্ব থাকে, তাহলে দোকানে চলে যাও। কর্মক্ষেত্রে পৌঁছে প্রতিটি কাজ করার আগে এভাবে একটু ভেবে দেখো যে, আমি সকালে স্বীয় নফসের সাথে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি, এটা তার পরিপন্থী নয় তো? কথা বলার আগে ভেবে দেখবে আমি যে কথা বলছি, তা আমার চুক্তির খেলাফ তো নয়? চিন্তা-ভাবনার পর যদি সেই কাজ বা কথাকে চুক্তির পরিপন্থী ও বিরোধী বলে মনে হয়, তাহলে তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করো। এটা দ্বিতীয় কাজ, যাকে 'মুরাকাবাহ' বলা হয়।

তৃতীয় কাজ—

৩. ঘুমানোর পূর্বে ‘মুহাসাবাহ’ (হিসাব নেওয়া)

এ কাজটি রাতে ঘুমানোর পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে। আর তা হলো, ‘মুহাসাবাহ’—স্বীয় নফসকে সম্বোধন করে বলবে যে, তুমি সকালে এই চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে যে, কোন প্রকার গোনাহর কাজ করব না। সকল কাজ শরীঅতের হুকুম অনুযায়ী করব। আল্লাহ পাকের হক এবং বান্দার হক যথাযথভাবে আদায় করব। এখন হিসাব নিয়ে দেখ! তুমি সারাদিন কোন্ কাজ চুক্তি অনুযায়ী করেছ। আর কোন্ কাজ চুক্তির খেলাফ করেছ। অতঃপর এভাবে নিজের সারাদিনের কাজ-কর্মের হিসাব নিবে যে, সকালে যখন আমি বাড়ী থেকে বের হয়েছি তখন অমুকের সাথে দেখা হয়েছে, তার সাথে কি কথা হয়েছে। যখন কর্মস্থলে পৌঁছেছি তখন সেখানে নিজ দায়িত্ব কিভাবে পালন করেছি। আমি ব্যবসায়ী ব্যবসা কিভাবে, কি নিয়মে করেছি। হালাল পন্থায় না হারাম পন্থায়? আর যত লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তাদের হক কি ভাবে আদায় করেছি? স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির হক কি ভাবে আদায় করেছি? এ সকল বিষয়ের হিসাব নিতে হবে—এর নাম ‘মুহাসাবাহ’।

অতঃপর শোকর আদায় করা

উপরোক্ত পদ্ধতিতে সকল কর্মের হিসাব নেওয়ার পর যদি দেখা যায় যে, তুমি সকালে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে তা পালন করার ব্যাপারে সফল হয়েছ, তাহলে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করো—হে আল্লাহ, তোমার শোকর যে, তুমি আমার ঐ চুক্তির উপর অবিচল থাকার তাওফীক দিয়েছ।

اللهم لك الحمد ولك الشكر

(হে আল্লাহ! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা এবং তোমার জন্যই সকল কৃতজ্ঞতা।)

এই শোকর আদায়ের ফল তা–ই হবে, যার নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর নেআমতের শোকরিয়া আদায় কর তবে আল্লাহ পাক ঐ নেআমত আরও বাড়িয়ে দিবেন। সুতরাং তোমরা যখন স্বীয় চুক্তিতে অবিচল থাকার মত নেআমত লাভ করে তার শোকর আদায় করেছ, তখন ভবিষ্যতে ঐ নেআমতের মধ্যে আরও প্রবৃদ্ধি ঘটবে এবং তার উপর ছওয়াবও লাভ করবে।

অন্যথা হলে তাওবা করো

আর যদি হিসাবের ফলে একথা প্রকাশ পায় যে, অমুক সময় আমি স্বীয় চুক্তির খেলাফ করেছি, অমুক কাজে আমার পদস্খলন ঘটেছে, আমি স্বীয় চুক্তির উপর টিকে থাকতে পারিনি, তাহলে সাথে সাথে তাওবা করবে। এবং বলবে ইয়া আল্লাহ! আমি এই চুক্তি তো করেছিলাম কিন্তু নফস ও শয়তানের ফাঁদে পড়ে ঐ চুক্তিতে অটল থাকতে পারিনি। ইয়া আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং তাওবা করছি। আপনি দয়া করে আমাকে মাফ করে দিন।

চতুর্থ কাজ—

নিজের উপর শাস্তি প্রয়োগ করো

তাওবা করার সাথে সাথে স্বীয় নফসের উপর কিছু শাস্তিও প্রয়োগ করবে। সে শাস্তি এভাবেও হতে পারে যে, তুমি তোমার নফসকে উদ্দেশ্য করে বলবে, যেহেতু তুমি চুক্তি ভঙ্গ করেছ, তাই তোমার এখন আট রাকাআত নফল নামায পড়তে হবে। এই শাস্তির ব্যাপারটি সকালে

চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময়ই নির্ধারণ করে নিবে। রাতে সমগ্র দিনের কাজের হিসেব নিয়ে শাস্তি প্রয়োগ কালে নফসকে সম্বোধন করে বলবে, তুমি নিজের সামান্য মজা ও আরামের জন্য ক্ষণিকের উপভোগ লাভের জন্য আমাকে চুক্তিভঙ্গের মত অন্যায় কাজে লিপ্ত করেছ, এজন্য তোমাকে এখন সামান্য শাস্তি পেতে হবে। আর তোমার শাস্তি এই যে, ঘুমানোর পূর্বে আট রাকাআত নফল নামায আদায় করতে হবে। নামায পড়ার পরই ঘুমানোর জন্য বিছানায় যেতে পারবে, এর পূর্বে শুতে পারবে না।

শাস্তি উপযুক্ত ও মধ্যম ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয়

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, শাস্তি এমন নির্দিষ্ট করবে যাতে নফসের উপর সামান্য চাপ পড়ে। তবে এমন কঠোর শাস্তিও দিবে না যাতে নফস ভয় পেয়ে যায়, আবার এমন হালকা শাস্তিও দিবে না যে, এ শাস্তির কোন আছরই নফসের উপর হয় না। যেমন মরহুম স্যার সাইয়েদ সাহেব যখন ইণ্ডিয়ায় আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন তখন এই নিয়ম করেন যে, সকল ছাত্রকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে এসে জামাআতের সঙ্গে আদায় করতে হবে। যে সকল ছাত্র জামাআতে হাযির হবে না তাদেরকে জরিমানা দিতে হবে। সম্ভবতঃ এক ওয়াক্ত নামাযের জন্য এক আনা জরিমানা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এর ফল এই হলো যে, যারা সম্পদশালী তারা পুরো মাসের সকল নামাযের জরিমানার টাকা একত্রে মাসের শুরুতেই অগ্রীম জমা দিয়ে দিত। এভাবে জরিমানা জমা দিয়ে নামায থেকে ছুটি নিয়ে নিত। এজন্য থানবী (রহঃ) বলেন, এত সামান্য জরিমানাও নির্ধারণ করবে না যে, একত্রে আদায় করে দিয়ে মুক্ত হয়ে যাবে। আবার এত বেশী নির্ধারণ করবে না যে, নফস পলায়ন করে। বরং মধ্যম পর্যায়ের ভারসাম্যপূর্ণ জরিমানা নির্ধারণ করবে। যেমন এক এক অন্যায়ের জন্য আট রাকাআত নফল নামায নির্দিষ্ট করা একটি মুনাসিব (সমীচীন) শাস্তি।

কিছুটা হিম্মত করতে হবে

সুতরাং তুমি যদি আত্মশুদ্ধি করতে চাও, তাহলে তোমাকে সামান্য একটু হাত–পা নাড়তে হবে, কিছুটা কষ্ট সহ্য করতে হবে। একটু হলেও হিম্মত করতে হবে। প্রতিজ্ঞা ও পণ করতে হবে। এমনি বসে বসে তো আর আত্মশুদ্ধি হবে না। কাজেই এই ফায়সালা করে নাও যে, যখনই নফস কোন ভুল পথে যাবে, তখন আট রাকাআত নফল নামায অবশ্যই পড়ব। নফস যখন দেখবে যে, আট রাকাআত নফল নামায পড়ার মত একটি নতুন বিপদ চেপে বসেছে, তখন আগামীতে এই নফসই তোমাকে গোনাহ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে, যেন সে এই আট রাকাআত পড়ার কষ্ট থেকে বেঁচে যায়। এভাবে তোমার নফস ধীরে ধীরে ইনশাআল্লাহ সঠিক পথে এসে যাবে। এরপর আর তোমাকে পথভ্রষ্ট করবে না।

নিম্নোক্ত চারটি কাজ করবে

ইমাম গাযালী (রহঃ)এর নসীহতের সারকথা এই যে, নিম্নোক্ত চারটি কাজ তোমাকে করতে হবে—

১. সকালে নফসের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া।

২. সকল কাজের আগে তার বৈধতা ও অবৈধতা চিন্তা করা।

৩. রাতে ঘুমানোর পূর্বে সারাদিনের আমলের হিসাব নেওয়া।

৪. যদি নফস অবাধ্য হয়, তাহলে রাতে ঘুমানোর পূর্বে তাকে শাস্তি দেওয়া।

এ আমল বরাবর করতে হবে

আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে। তা এই যে, দু' চার দিন এই আমল করে এ কথা মনে করা যাবে না, ব্যস! এখন তো আমি মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছে গেছি। বুযুর্গ হয়ে গেছি। বরং এ আমল বরাবর করতে

হবে। এ সময় কখনো তুমি জয়ী হবে আবার কখনো শয়তান জয়ী হবে। তবে এমন যেন না হয় যে, শয়তান কোনদিন জয়ী হলে তুমি ভয় পেয়ে এ আমলই ছেড়ে দাও। কারণ, এতেও আল্লাহ পাকের বিশেষ হেকমত নিহিত আছে। এভাবে হোঁচট খেয়েও যদি তুমি চলতে থাক, তাহলে ইনশাআল্লাহ একদিন মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছে যাবে। আর যদি এ আমল করে প্রথম দিনই মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছে যাও, তাহলে তার ফল এই হবে যে, মস্তিস্কে শয়তানের এই ধোঁকা বাসা বাঁধবে যে, আমি তো হযরত জুনায়েদ বাগদাদী অথবা শিবলী নোমানী হয়ে গেছি। সুতরাং একথা মনে রাখতে হবে যে, এই আমলে কখনো তুমি সফল হবে আবার কখনো ব্যর্থ হবে। যেদিন সফল হও সেদিন এই সফলতার জন্য আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করো। আর যেদিন ব্যর্থ হও সেদিন এই ব্যর্থতার জন্য তাওবা ও ইস্তিগফার করো এবং স্বীয় নফসের উপর শাস্তি প্রয়োগ করো। সাথে সাথে নিজের অসৎ কর্মের প্রতি অনুতপ্ত ও লজ্জিত হও। এই অনুতাপ ও অনুশোচনা মানুষকে ব্যর্থতার অতল গহ্বর থেকে সফলতার শীর্ষে পৌঁছে দেয়।

হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)এর একটি কাহিনী

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)এর একটি কাহিনী লিখেছেন। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) প্রতি রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের জন্য উঠতেন। এক রাতে তিনি জাগ্রত হতে পারলেন না। ফলে তাহাজ্জুদ কাযা হয়ে গেল। সারাদিন কেঁদে কেঁদে অতিবাহিত করলেন। সাথে সাথে তাওবা ও ইস্তিগফার করে দুআ করলেন, হে আল্লাহ! আজ আমার তাহাজ্জুদ ছুটে গেল। পরবর্তী রাতে তিনি ঘুমিয়ে আছেন, তাহাজ্জুদের সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগিয়ে তুলল। তিনি জাগ্রত হয়ে লক্ষ্য করলেন, যে তাকে জাগিয়ে তুলেছে সে অপরিচিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? ঐ ব্যক্তি

বলল, আমি ইবলিস। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বললেন, তুমি যদি ইবলিস হয়ে থাক, তাহলে আমাকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত করায় তোমার কি লাভ? শয়তান বলল, আপনি উঠুন এবং তাহাজ্জুদ পড়ুন। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বললেন, তুমি তো মানুষকে তাহাজ্জুদ থেকে বিরত রাখ, এখন তাহাজ্জুদের সহায়তাকারী কি ভাবে হলে? শয়তান বলল, আসল কথা হল, গতরাতে আমি আপনাকে তাহাজ্জুদের সময় ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি, ফলে আপনার তাহাজ্জুদ ছুটে গেছে। কিন্তু সমগ্র দিন আপনি এজন্য কেঁদেছেন এবং ইস্তিগফার করেছেন। ফলে আল্লাহ পাকের নিকট আপনার মর্যাদা এত বেশী বেড়েছে যে, তাহাজ্জুদ পড়লেও এত বৃদ্ধি পেত না। কাজেই এটাই ভাল ছিল যে, আপনি তাহাজ্জুদ পড়েন। এজন্যই আজ আমি নিজেই আপনাকে ডাকতে এসেছি যেন আপনার মর্যাদা আরো না বাড়ে।

অনুশোচনা ও তাওবা দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া

উপরোক্ত কাহিনী থেকে জানা গেল যে, মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে তার বিগত দিনের কোন ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে সে ভুলের পুনরাবৃত্তি না করার পণ করে, তাহলে এই তাওবা ও অনুশোচনার বদৌলতে আল্লাহ পাক বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে কোথা থেকে কোথায় পৌছে দেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী হযরত ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী (রহঃ) বলতেন, যখন আল্লাহ পাকের কোন বান্দা অন্যায় করার পর আল্লাহ পাকের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চায়, তখন আল্লাহ পাক ঐ বান্দাকে বলেন, তুমি যে অন্যায় করেছ, তোমার এই অন্যায়ই তোমাকে আমার করুণা, রহমত ও অসীম দয়া ও ক্ষমার যোগ্য করেছে। তোমার এই অন্যায়ই তোমার জন্য উপকারী হয়েছে।

হাদীছ শরীফে আছে, ঈদুল ফিতরের দিন আল্লাহ পাক স্বীয় ইজ্জত ও প্রতাপের কসম খেয়ে ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আজ এ

সকল লোক এখানে (ঈদগাহে) একত্রিত হয়ে তাদের উপর অর্পিত ফরীযাহ (দায়িত্ব) আদায় করছে এবং আমাকে ডাকছে, আমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছে। নিজেদের আশা–আকাংখা পূরণের জন্য দু'আ করছে। আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, আমি অবশ্যই তাদের দু'আ কবুল করব। তাদের ভুল–ত্রুটি ও অন্যায়কে নেকীতে পরিবর্তিত করে দিব। এখানে প্রশ্ন হয়, এ সকল গোনাহ কি ভাবে নেকীতে পরিণত হবে? এর উত্তর এই যে, যখন কোন মানুষ দ্বারা অজ্ঞতা অসতর্কতার মুহূর্তে কোন গোনাহ হয়ে যায়, তখন যদি সে অনুতপ্ত হয়ে আফসোস করে আল্লাহ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, আল্লাহ পাককে ডাকতে থাকে আর বলে, ইয়া আল্লাহ, অজ্ঞতা ও অসতর্কতায় এ গোনাহ করে ফেলেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তাহলে আল্লাহ পাক তার অনুতাপের কারণে শুধু যে কেবল তার গোনাহ মাফ করেন তা নয়, বরং এর ফলশ্রুতিতে তার মর্যাদাও বৃদ্ধি করেন। এভাবে এ গোনাহও তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে এবং এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। যেমন কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন—

فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ - الفرقان ٧٠

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক তাদের গোনাহসমূহকে নেকীতে পরিবর্তিত করেন।

হযরত বাবা নজম আহসান সাহেব (রহঃ) নামে আমাদের একজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হযরত থানবী (রহঃ)এর খলীফা ছিলেন। উচ্চ পর্যায়ের ওলী আল্লাহ ছিলেন। মাঝে মাঝে কবিতাও রচনা করতেন। তাঁর রচিত কবিতার নিম্নোক্ত পংক্তিটি আমার খুবই প্রিয়, যার দরুণ এটা বারবার মনে পড়ে—

دولتیں مل گئیں ہیں آہوں کی

ایسی تیسی میرے گناہوں کی

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যখন আমাদেরকে আপন গোনাহর কারণে অনুতপ্ত হয়ে অনুনয়–বিনয় সহ ক্রন্দন করার মত সৌভাগ্য দান করেছেন এবং আল্লাহ পাকের নিকট এই বলে দু'আও করছি, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমার এ গোনাহ মাফ করে দিন, আমি ভুল করেছি। এ আন্তরিক দু'আর পর গোনাহ আর আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এই গোনাহও যেহেতু আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, আর আল্লাহ পাক কোন জিনিস হেকমত ছাড়া সৃষ্টি করেননি। কাজেই গোনাহ সৃষ্টির মধ্যেও কোন না কোন হেকমত ও কল্যাণ নিহিত আছে। আর সে হেকমত ও কল্যাণ এই যে, গোনাহ করে ফেলার পর যখন অনুতপ্ত হয়ে কান্নাকাটি করবে এবং তাওবা করবে এবং ভবিষ্যতে গোনাহ না করার দৃঢ় পণ করবে, তখন এই তাওবার বদৌলতে আল্লাহ পাক তোমার মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন।

নফসের সাথে সমগ্র জীবনব্যাপী লড়াই করতে হবে

কাজেই রাতে সারাদিনের আমলের হিসাব নিয়ে যখন জানতে পারবে যে, আজ গোনাহ হয়ে গেছে, সাথে সাথে তাওবা ও ইস্তিগফার করবে, আল্লাহ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তন (তথা মনোনিবেশ) করবে। হতাশ হয়ো না। কারণ, এই জীবন একটি জিহাদ ও সংগ্রামের নাম। কাজেই মৃত্যু পর্যন্ত নফস ও শয়তানের মুকাবিলা করতে হবে, লড়াই করতে হবে। আর মুকাবিলা ও লড়াইতে এমন তো হয়েই থাকে যে, কখনো তুমি বিজয়ী হবে শত্রু পরাজিত হবে, আবার কখনো তুমি পরাজিত আর তোমার শত্রু বিজয়ী হবে।

সুতরাং কখনো শয়তান যদি তোমাকে ফেলে দেয়, তাহলে সাহস হারাবে না, পড়ে থাকবে না। বরং পুনরায় নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবে এবং শয়তানের মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক তোমার সঙ্গে এ ওয়াদা করেছেন যে,

যদি তুমি হিম্মত না হারিয়ে পুনরায় শয়তানের মুকাবিলার জন্য দাঁড়িয়ে যাও এবং আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য চাও, তাহলে ইনশাআল্লাহ চূড়ান্ত বিজয় তোমারই হবে। আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন—

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ - القصص ٨٣

অর্থাৎ শেষ পরিণতি মুত্তাকিদের হাতে। বিজয় তোমারই হবে।

আল্লাহ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন—

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا - العنكبوت ٦٩

যারা আমার রাস্তায় জেহাদ করল, অর্থাৎ নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে এভাবে জেহাদে অবতীর্ণ হলে যে, শয়তান ধোঁকা দিয়ে তোমাকে ভুল পথে নিতে চাচ্ছে তুমি তার সাথে মুকাবিলা করছ, চেষ্টা করে ভুল পথ থেকে বেঁচে থাকছ, তাহলে আমার ওয়াদা যে, আমি অবশ্য অবশ্যই শয়তানের সাথে মুকাবেলাকারী এবং প্রচেষ্টাকারীদেরকে আমার সন্তুষ্টির পথ দেখিয়ে দিব।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি এই আয়াতের অর্থ এই করে থাকি যে, যে সকল লোক আমার সন্তুষ্টির পথে চলার জন্য চেষ্টা করে, আমি তাদের হাত ধরে নিজের রাস্তায় চালাই। অতঃপর তিনি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এই আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, যখন বাচ্চা হাঁটতে শিখে, তখন বাবা-মার এই আকাংখা হয় যে, বাচ্চা যেন নিজে নিজে হাঁটে, কাজেই তাঁরা তাকে এভাবে হাঁটতে শিখায় যে, বাচ্চাকে সামান্য দূরে দাঁড় করে দিয়ে নিজে একটু সরে গিয়ে বাচ্চাকে নিজের কাছে ডাকে। বাচ্চা যদি অগ্রসর না হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে বাবা-মাও দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে কোলে তুলে নেয় না। কিন্তু যদি বাচ্চা এক কদম অগ্রসর হয়ে দ্বিতীয় কদমেই পড়ে যেতে থাকে, তাহলে বাবা-মা তাকে পড়তে দেয় না বরং নিজে অগ্রসর হয়ে তাকে ধরে ফেলে এবং কোলে তুলে নেয়। কারণ, বাচ্চা কদম বাড়িয়ে নিজ সামর্থ্য

অনুসারে চেষ্টা করেছে। তদ্রূপ যখন মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির রাস্তায় চলবে, তখন কি আল্লাহ পাক তাকে সহায়–সম্বলহীন অবস্থায় একা ছেড়ে দিবেন? তাকে ধরবেন না? এরূপ করবেন না। বরং এ আয়াতে আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন যে, যখন তোমরা আমার সন্তুষ্টির রাস্তায় চলার জন্য সামর্থ্য অনুসারে চেষ্টা করবে, তখন আমি অগ্রসর হয়ে তোমাকে কোলে তুলে নিয়ে যাব। কাজেই হিম্মত করে অগ্রসর হও। তোমার সাধ্য মত তুমি চেষ্টা কর। নিরাশ হয়ে বসে থেকো না।

سوئے مایوسی مرو امید ها است

سوئے تاریکی مرو خور شید ها است

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দরবারে নৈরাশ্য বলে কিছু নেই, সবই আশার আলো। কারণ, অন্ধকার ঐ দরবারে প্রবেশ করতে পারে না। সুতরাং নফস ও শয়তানের সাথে মুকাবিলা করতে থাক। যদি ভুল হয়ে যায়, তাহলে আশার আঁচল ছেড়ে দিও না। নিরাশ হইও না। বরং প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখ, তাহলে ইনশাআল্লাহ একদিন তুমি অবশ্যই সফলকাম হবে।

মোটকথা এই যে, তুমি তোমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন কর, আল্লাহ তাঁর কাজ অবশ্যই করবেন। মনে রেখো! তোমার দায়িত্বে যে কাজ আছে, তাতে ত্রুটি–বিচ্যুতি হতে পারে। আল্লাহ পাকের কাজে কোন প্রকার ত্রুটি–বিচ্যুতি হবে না। কাজেই তুমি যখন কদম বাড়াবে, তখন ইনশাআল্লাহ তোমার রাস্তা খুলে যাবে।

হযরত উমর (রাযিঃ)এর হাদীছে এ দিকেই ইশারা করা হয়েছে—

حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا -

অর্থাৎ আখেরাতের হিসাবের পূর্বে নিজে নিজের হিসাব নাও।

আল্লাহ তাআলাকেও কি এ উত্তর দিবে?

আমাদের শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী হযরত ডাক্তার আবদুল হাই সাহেব (রহঃ) বলতেন, নিজে নিজের হিসাব নেওয়ার একটি পদ্ধতি এই যে, তুমি এই কল্পনা কর যে, আজ তুমি হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার হিসাব-কিতাব হচ্ছে। আমলনামা দেখানো হচ্ছে। তোমার আমলনামায় যে সকল অন্যায় কাজ লেখা আছে তা তোমার সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে জিজ্ঞেস করছেন, তুমি এই অপকর্ম ও গোনাহের কাজ কেন করেছ? তোমরা কি সে সময় আল্লাহ তাআলাকেও সেই একই উত্তর দিবে, যা আজ মৌলবীদেরকে দিয়ে থাক? আজকে যখন তোমাদেরকে কোন মাওলানা ছাহেব বা পীর সাহেব এ কথা বলেন যে, অমুক কাজ করো না। দৃষ্টির হেফাজত কর। সুদ খাওয়া থেকে বেঁচে থাক। গীবত ও মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাক। টেলিভিশনে পরিবেশিত অশ্লীল ও বেহায়াপনার প্রোগ্রাম দেখো না। বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে পর্দাহীনতা থেকে বেঁচে থাক। তোমরা মাওলানা সাহেবদের এ কথার উত্তরে আজকাল বলে থাক যে, আমরা কি করব? যুগ এমন খারাপ হয়ে গেছে। সারা দুনিয়ার মানুষ উন্নতি করছে। মানুষ চাঁদে পৌছে গেছে। আমরা এই উন্নতির যুগেও তাদের চেয়ে পিছে পড়ে থাকব? দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকব? আজকের এই সমাজে মানুষ এ সকল কাজ না করে বাঁচতে পারে না। এটা ঐ উত্তর যা আজ তোমরা মাওলানা সাহেবদেরকে দিয়ে থাক। আল্লাহ তাআলার নিকটও কি এই উত্তরই দিবে? এই উত্তর কি আল্লাহ পাকের নিকট যথার্থ হবে? নিজের বুকে হাত রেখে চিন্তা করে বল। এই উত্তর যদি আখেরাতে আল্লাহ তাআলার নিকট না চলে, তাহলে আজ দুনিয়াতেও এটা যথেষ্ট নয়।

সাহস ও উদ্দীপনা আল্লাহপাকের নিকটই চাও

যদি তুমি আল্লাহ তাআলার নিকট এই উত্তর দাও যে, ইয়া আল্লাহ! সমাজ ও পরিবেশের কারণে আমি গোনাহর কাজ করতে বাধ্য হয়েছি।

তাহলে আল্লাহ্ তাআলা একথা জিজ্ঞেস করবেন, আচ্ছা বল তো, তুমি অক্ষম ছিলে না আমি অক্ষম ছিলাম? তোমরা এই উত্তরই দিবে যে, ইয়া আল্লাহ! আমিই অক্ষম ছিলাম। আপনি অক্ষম ছিলেন না। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি যখন অক্ষম ছিলাম না, তুমি তাহলে নিজ অক্ষমতা দূর করার জন্য আমার নিকট দু'আ করলে না কেন? আমার কি তোমার ঐ অক্ষমতাকে দূর করার ক্ষমতা ছিল না? আমার যদি ক্ষমতা থেকে থাকে, তাহলে আমার নিকট সাহায্য চাইতে এবং বলতে, ইয়া আল্লাহ! আমার সামনে এই বিপদ (গোনাহর কাজ) এসেছে। হয় আপনি আমাকে বিপদ (গোনাহ্) থেকে রক্ষা করুন, না হয় আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। এবং আমাকে এ (গোনাহর) জন্য শাস্তি দিবেন না।

এখন বল, আল্লাহ্ পাক যদি উপরোক্ত প্রশ্ন করেন, তাহলে এ প্রশ্নের কোন উত্তর তোমাদের নিকট আছে কি? যদি এর কোন উত্তর তোমাদের নিকট না থাকে, তাহলে আজ জীবন থাকতেই নিম্নোক্ত কাজগুলো করে নাও। আর তা এই যে, যে সকল কাজের ক্ষেত্রে তুমি নিজকে অক্ষম মনে কর, চাই তা (ত্যাগ করা) বাস্তবিকই অসম্ভব হোক, কিংবা সমাজ ও পরিবেশের কারণে তা (ত্যাগ করা) অসম্ভব হোক। উভয় প্রকারের জন্য প্রতিদিন আল্লাহ পাকের নিকট এই বলে দুআ করবে—

ইয়া আল্লাহ! এ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, যার দরুন আমি নিজে এ (গোনাহ্) থেকে বিরত থাকার সাহস পাচ্ছি না, হিম্মত হচ্ছে না। আপনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, আমার এই সমস্যাকেও দূর করে দিতে পারেন। এবং আমার এই সাহসহীনতাও (ভীরুতা) দূর করতে পারেন। আমার এই বিপদকে (সমস্যা) দূর করে দিন এবং আমাকে এই গোনাহ্ থেকে বিরত থাকার উদ্দীপনা ও সাহস দান করুন।

তাঁর দয়ার কোন সীমা নেই

মোটকথা, আল্লাহ পাকের নিকট চাইতে হবে। অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা বলা যায় যে, যখন কোন বান্দা আল্লাহ তাআলার নিকট এভাবে দু'আ করে তখন অবশ্যই আল্লাহ পাক তার দু'আ কবুল করেন। কেউ যদি দু'আই না করে, তাহলে তার সমস্যার কোন সমাধান নেই। আমাদের মুরুব্বী হযরত ডাঃ আবদুল হাই সাহেব (রহঃ) এ কবিতা পাঠ করতেন—

کوئی حسن شناس آدا نہ ہو تو کیا علاج

انکی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں

(অর্থাৎ সৌন্দর্য অবলোকন করার মত দৃষ্টিই যদি না থাকে তবে তার কি ব্যবস্থা হতে পারে? তার দয়ার তো কোন সীমা নেই।)

সুতরাং যদি দু'আই না করা হয়, তাহলে তার কোন সমাধান নেই। আল্লাহ পাকের দয়ার ভাণ্ডার তো অনেক প্রশস্ত, সব সময় খোলা। আজ আমরা সকালে ও রাতে যে চারটি কাজ করার (ব্যবস্থাপত্রের) কথা আলোচনা করলাম, যদি আমরা সেমতে আমল করতে শুরু করি, তবে ঐ উপদেশের উপর আমলকারী সাব্যস্ত হব। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে মাফ করুন এবং উপরোক্ত বয়ান অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

আখেরাত ঃ পুরস্কার ও শাস্তি

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

যে সকল মৌলিক বিশ্বাসের (আকায়েদের) উপর ইসলামের ভিত্তি, তার মধ্যে প্রধান হলো, তাওহীদ ও রেসালাতের আকীদা। তাওহীদ ও রেসালাতের পর অন্যতম আকীদা হলো 'আখেরাত'এর আকীদা। আখেরাতের অর্থ হলো, মানুষের মৃত্যুর পর এমন একটি স্থায়ী জীবনে সে প্রবেশ করবে, যে জীবনে তাকে এই দুনিয়ার জীবনে কৃত প্রতিটি কার্যকলাপের হিসাব দিতে হবে। এই স্থায়ী জীবনকেই 'আখেরাত' বলা হয়। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বার বার এই মৌলিক বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক আখেরাতে মানুষকে নেক ও সৎ কাজের দরুন পুরস্কৃত করবেন এবং অন্যায় ও অসৎ কাজের দরুন শাস্তি প্রদান করবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

(سورة الزلزال ٧-٨)

অর্থাৎ সুতরাং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক কাজ করবে সে তা (আখেরাতে) দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ গোনাহর কাজ করবে সেও তা দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল, আয়াত ৭–৮)

আখেরাতের এই স্থায়ী জীবন যদিও আমাদের দুনিয়ার জীবনে দৃষ্টিগোচর হয় না, তা সত্ত্বেও আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তি আমাদের এই দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মেরই অবশ্যম্ভাবী ফলাফল।

আমরা যখন লক্ষ্য করি যে, বিশ্বজগতের এই ব্যবস্থাপনা কত মজবুত ও অলংঘনীয় হেকমতপূর্ণ নিয়মে চলছে, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছি যে, এই জগত এমনি এমনি নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভ করেনি বরং এ জগতকে নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন। তার কোন কাজই হেকমত (প্রজ্ঞা)শূন্য নয়। এছাড়া

আমরা আরো লক্ষ্য করি যে, এ দুনিয়াতে সব ধরনের লোকই বসবাস করছে। দুনিয়াবাসীদের মধ্যে ভদ্র ও শরীফ লোকও আছেন, আবার অভদ্র–দুষ্ট প্রকৃতির লোকও আছে। পরহেযগার–খোদাভীরু লোকও আছেন, আবার গোনাহগার খোদাদ্রোহী লোকও আছে। জালেম–অত্যাচারী লোকও আছে, আবার নিপীড়িত–নির্যাতিত লোকও আছে। সুতরাং এই দুনিয়ার জীবনই যদি সবকিছু হয়, দুনিয়ার জীবনের পর যদি আর কোন জীবন না থাকে, তাহলে কুদরতের এই সকল কারখানা ও ব্যবস্থাপনা একান্তই ব্যর্থ ও বেকার হয়ে যাবে। কারণ, এভাবে নেক ও সৎ লোকেরা তাদের সৎকর্মের কোন পুরস্কারও পাবেন না এবং গোনাহগার ও অত্যাচারীদের তাদের পাপ, অত্যাচার ও অবাধ্যতার দরুন কোন শাস্তিও দেওয়া যাবে না।

এরূপ কাজ বিশ্বজগতের স্রষ্টা আল্লাহ্ পাকের হেকমত ও প্রজ্ঞার সম্পূর্ণ পরিপন্থী যে, তিনি জালেম ও মজলুম, সৎ ও অসৎ সকলের সঙ্গে একই ব্যবহার করবেন। এমনটি হতেই পারে না। সুতরাং এই বিশ্বজগত নিজেই এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত্যুর দ্বারা মানুষের জীবন চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যায় না বরং মৃত্যুর পর মানুষ ঐ জগতে চলে যায় যেখানে তার দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের দরুন পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করতে হয়। পবিত্র কুরআনে এদিকে ইশারা করে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ –

(سورة المؤمنون– ١١٥)

অর্থাৎ তোমরা কি একথা মনে কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না।

(সূরা আল–মুমিনূন, আয়াত ১১৫)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, আখেরাত এবং (সেখানকার) পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা একটি যৌক্তিক প্রয়োজন। যদি এ ব্যবস্থা না থাকত, তাহলে বিশ্বজগতের এই সমগ্র কারখানা বেকার ও

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত। এ কারণেই আল্লাহ্ পাক মানুষকে এ সকল বিধানাবলী (আদেশ–নিষেধ) শিক্ষা দেওয়ার জন্য যত নবী–রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) প্রেরণ করেছেন, তাঁদের সকলেই আখেরাতের আকীদার শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রদান করেছেন এবং সেখানের অবস্থাসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। স্বয়ং কুরআন শরীফেরও প্রায় এক–তৃতীয়াংশ জুড়ে আখেরাত এবং সেখানকার পুরস্কার ও শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরআন–হাদীছ ও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের শিক্ষায় আখেরাতের আকীদা সম্পর্কে এত বেশী গুরুত্বারোপের কারণ এই যে, মানুষকে সত্যিকার মানুষ বানানোর জন্য আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তির উপর অটল ও অবিচল ঈমানের চেয়ে অধিক কার্যকরী আর কোন ব্যবস্থা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মস্তিস্কেও অন্তরে একথা বসে না যাবে যে,তাকে আল্লাহ্ পাকের সামনে উপস্থিত হয়ে নিজের প্রতিটি কথা ও কাজের হিসাব দিতে হবে, জওয়াবদিহি করতে হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদার দাস হয়ে থাকে এবং সে পাপকর্ম, বদ অভ্যাস ও অসৎ চরিত্র থেকে মুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে না।

আখেরাতে আল্লাহ্ পাকের নিকট হিসাব দেওয়ার বিষয়টি যদি মানুষের সামনে না থাকে, তাহলে কঠোর থেকে কঠোর আইনও মানুষকে অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে না। কারণ, পুলিশ ও আইন–আদালতের ভয় তাকে বেশী থেকে বেশী দিনের আলোতে ও শহরের ভীড়ে অন্যায়–অপকর্ম থেকে বিরত রাখবে কিন্তু রাতের আঁধার এবং বন ও মাঠের নির্জনতায় মানুষের অন্তরে প্রহরীর কাজ একমাত্র আল্লাহর ভয় ও আখেরাতে জবাবদিহির চিন্তা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারে না।

উভয় জগতের সম্রাট মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে যে বিস্ময়কর বিপ্লব সংঘটিত করেছিলেন তার

একটি মূল কারণ এটাও ছিল যে, তিনি তাঁর দিবারাত্রির পরিশ্রম, শিক্ষা ও উপদেশ দানের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে আখেরাতের চিন্তা এমন মজবুতভাবে বসিয়ে দিয়েছিলেন যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আখেরাতের হিসাব–কিতাব ও জবাবদিহিকে সদা–সর্বদা এমনভাবে সামনে রাখতেন যেন তাঁরা আখেরাতের বিষয়াবলীকে খোলা চোখে দেখছেন।

ফলশ্রুতিতে আখেরাতের এই চিন্তা তাঁদের দ্বারা এমন এমন কঠিন কাজ অতি সহজে করিয়ে নিত যা সম্পন্ন করা যুগ যুগ ধরে শিক্ষা ও ট্রেনিং নেওয়ার পরও কঠিন মনে হয়।

যেমন, মদ্যপানের অভ্যাসের কথাই ধরা যাক। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ সভ্য জাতি এ ব্যাপারে একমত এবং বাস্তবিক ও যৌক্তিকভাবেও এ কথা স্বীকার করে যে 'মদ্যপান' একটি বদ অভ্যাস, যা মানুষের স্বাস্থ্য ও চরিত্র উভয়কেই ধ্বংস করে দেয়। কাজেই দেখা যায় যে, এ ব্যাপারে অনেক মূল্যবান ও বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে, অনেক মূল্যবান গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও আজকের সভ্য পৃথিবীতে যারা নিজেদের মেধা, বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্য অনেক অহংকার করে থাকে, তারা তাদের সকল অকাট্য দলীলে সজ্জিত অত্যন্ত কার্যকরী পন্থায় আধুনিক ও উন্নত প্রচার মাধ্যম সহ চিন্তা–চেতনা পরিবর্তনকারী আধুনিকতম যন্ত্র ও কৌশল ব্যবহার করা সত্ত্বেও মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি থেকে মদ্যপান ছাড়াতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আজকের সভ্য পৃথিবী শিক্ষা–দীক্ষা, চরিত্র গঠন ও উৎসাহ দান থেকে নিয়ে মদ্যপানের শাস্তি প্রয়োগের আইন প্রণয়ন করা সত্ত্বেও মদ্যপায়ীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে।

পক্ষান্তরে আরবের (জাহেলী যুগের) সেই সমাজের কথা চিন্তা করুন, যেখানে আল্লাহ পাক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন।

জাহেলী যুগ এবং ইসলামের প্রথম যুগ পর্যন্ত আরবের লোকদের অবস্থা এই ছিল যে, বাড়ীতে বাড়ীতে মদ পানির মত পান করা হত। মদের সাথে আরবদের ভালবাসার এই অবস্থা ছিল যে, মদের জন্য আরবী ভাষায় প্রায় আড়াই শ' নাম পাওয়া যায়। মদ্যপান করা তাদের নিকট কোন অন্যায় তো নয়ই বরং তা অহংকার ও গৌরবের ব্যাপার ছিল, কিন্তু পবিত্র কুরআন যখন মদকে হারাম বলে ঘোষণা করল তখন ঐ আরব জাতি সাথে সাথে নিজদের এই প্রিয়তম পানীয়কে এমনভাবে ত্যাগ করল যে, ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুস্কর।

হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) বলেন, মদ্যপান হারাম হওয়ার বিধান সম্বলিত আয়াত যখন নাযিল হলো, তখন আমি মদ্যপানে ব্যস্ত লোকদের একটি মজলিসে গিয়ে সে আয়াত শোনালাম। সে সময় মদের পেয়ালা কারো কারো ঠোঁটের সাথে লেগেছিল, সামান্য কিছু মদ মুখের ভেতরে ছিল। তাঁরা আয়াত শোনার পর এটাও পছন্দ করলেন না যে, মুখের ভেতরকার মদটুকু গলাধঃকরণ করবেন বরং তা সাথে সাথে ফেলে দিয়ে কুলি করে মুখ সাফ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি এক মজলিসে মদ পরিবেশন করছিলাম। হঠাৎ ঘোষণা শুনতে পেলাম যে, মদ্যপান হারাম করা হয়েছে। এই ঘোষণা শুনে সমগ্র মজলিসের লোকেরা মদ ফেলে দিল। মদের বড় বড় পাত্র (মটকা) ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলল, ফলে মদীনার গলিতে গলিতে মদের নহর প্রবাহিত হলো।

অভ্যাস ও চরিত্রের এই বিস্ময়কর পরিবর্তন, আসলে মহান আল্লাহর প্রতি গভীর ভালবাসা ও ভয় এবং (আখেরাতে দুনিয়ার প্রতিটি কথা ও কর্মের হিসাব দান ও তার ফলে) পুরস্কার বা শাস্তির ব্যাপারে অটল অবিচল ঈমানের ভিত্তিতেই সম্ভব হয়েছিল। এ বিষয়টি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মন–মস্তিস্ক ও শিরা–উপশিরায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। আখেরাতের প্রতি মজবুত ঈমানের ফল এই হয়েছিল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে

অপরাধের পরিমাণ কমতে কমতে একেবারে শূন্যের কোঠায় চলে এসেছিল। মানবিক চাহিদা (ও দুর্বলতার) কারণে যদি কারো দ্বারা কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েও যেত, তবুও তাকে গ্রেফতার করার জন্য কোন পুলিশের প্রয়োজন হয়নি বরং (অন্যায় হয়ে গেলে) নিজেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে এবং বারবার অনুরোধ করে নিজের উপর শাস্তি প্রয়োগ করাত। কারণ, এই হাকীকত (বাস্তব অবস্থা) তাদের অন্তরে গাঁথা ছিল যে, দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের আযাবের তুলনায় অনেক হালকা ও সহনীয়।

আজকেও যদি কোন জিনিস পৃথিবীকে অপরাধ, চারিত্রিক অধঃপতন, নিরাপত্তাহীনতা, ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে মুক্তি দিতে পারে, তাহলে একমাত্র আল্লাহর ভয়, আখেরাতের ফিকির এবং আল্লাহ পাকের নিকট হিসাবের ভিত্তিতে পুরস্কার অথবা শাস্তি লাভের ইয়াকীনই তা পারবে। কিন্তু এ জন্য এ সকল আকীদার শুধু মৌখিক আলোচনা যথেষ্ট নয়, বরং এই চিন্তা ও বিশ্বাস সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখতে হবে।

এর পদ্ধতি এই যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফে আখেরাতের যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে, তা বার বার পাঠ করতে হবে এবং দৈনন্দিন ব্যস্ততার মধ্য হতে কিছু সময় এই চিন্তা করার জন্য বের করতে হবে যে, 'মৃত্যুর পর কি হবে?'

এ প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اكثروا ذكر هاذم اللذات يعنى الموت -

অর্থাৎ সকল স্বাদ বিনাশকারী জিনিস অর্থাৎ মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সকল বাণীর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন॥

সমাপ্ত

দুনিয়ার ওপারে

আমেরিকার বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিক ডাক্তার 'রেমন্ড এ মোদী' কর্তৃক রচিত সমগ্র দুনিয়াব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থের উপর জগদ্বিখ্যাত আলেমেদ্বীন জাস্টিস মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উছমানী সাহেব কর্তৃক ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত পর্যালোচনামূলক রচনার বঙ্গানুবাদ।

এ গ্রন্থে তিনি মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা লোকদের মৃতপ্রায় অবস্থায় অবলোকনকৃত বিরল বিস্ময়কর এবং বিচিত্র দৃশ্যাবলী ও অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন।

ডাক্তার মোদীর এ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর মাত্র এক বছরের সামান্য সময়ে ত্রিশ লক্ষ কপি বিক্রি হয়।

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
পাঠকবন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড)
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : [illegible]